স্নেহলতা

বা

পালিতা।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত।

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা,
কাশিয়াবাগান বাগানবাটী হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১২৯৯।

মূল্য ১ এক টাকা।

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীতারিণীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

উপহার।

সখি,

সুখেরে লভিবারে, দুখের হা হুতাশ!
হাসির ফাঁশে অশ্রু, আপনা চাহে নাশ!
আঁধার, আলো মাঝে, ডুবাতে চাহে প্রাণ!
বিরহ হতে চায়, মিলনে অবসান!
হায়! মিছে এ আঁকু বাকু, মিছে এ যাচাযাচি!
ততই দূরে দূরে, যতই কাছাকাছি!
চাহিয়া দেখি আর, দেখিয়া মরি ভেবে,
আমার এই স্নেহ, কারে দেব কে নেবে?
সখিগো ফিরাও না, এনেছি তোরি তরে,
না হয় দিও ফেলে, আড়ালে কিছু পরে!

স্নেহলতা

বা

পালিতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় একজন সঙ্গতিপন্ন লোক। তাঁহার পিতা তাঁহার জন্য কিছু বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া যান, আর তিনিও নিজে ডাক্তারি করিয়া বিলক্ষণ দু পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছেন। জগচ্চন্দ্রের বহির্বাটী তাঁহার অর্থ স্বচ্ছলতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করে, কিন্তু অন্তঃপুর—যেখানে তাঁহার গৃহলক্ষ্মী বিরাজমান সেখানে লক্ষ্মী দেবতার আবির্ভাব অনুভব করা নিতান্ত সহজ নহে।

সাধারণ বাঙ্গালী বাটীর যেরূপ দস্তুর, অন্তঃপুরের ঘরগুলি সবই ছোট ছোট, ঘরের সাজ সজ্জা অতি সামান্য, কিছু নাই বলিলেই হয়—বরঞ্চ বিপরীত যথেষ্ট আছে। ঘরের দেয়ালে কালীর ছোপ, তেলের দাগ, কোন কোন স্থলে পানের পিকের চিহ্নেরও অভাব নাই, জানালা দরজাগুলির অবস্থাও ইহা হইতে বিশেষ ভাল নহে, আশে পাশের এই সকল অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে বারান্দা ও গৃহতল কেবল মাত্র আশ্চর্য্যরূপ তক তক করিতেছে।

আপাততঃ জগৎ বাবুর শয়নকক্ষে আমরা প্রবেশ করি। বাড়ীর মধ্যে এই ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, ঘরের এক দিকে পালঙ্ক, পালঙ্কের পাশেই একখানি কৌচ। অন্যদিকের দুই দেয়ালে ছোট বড় দুটি আলমারি, আলমারির মাথায় একরাশ করিয়া জিনিস পত্র, গৃহের মধ্যভাগের একধারে একটি টেবিল, জগৎ বাবুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে তাহা পূর্ণ, অন্যধারে জগৎ বাবুর স্ত্রীর কাপড়ের আলনা, আলনার একপাশে দেয়ালের গায় একটা মস্ত লোহার হুকে কতক-গুলি ছেঁড়া চুল টাঙ্গান। অন্য পার্শ্বে কৃষ্ণরাধিকার একখানি পট। দেয়ালে কোন থানে পটও আছে, কোন থানে দু এক খানি ছবিও আছে, তাহার মধ্যে জগৎবাবু ও তাঁহার প্রথম স্ত্রীর বহুদিনের তোলা অস্পষ্ট ফোটোগ্রাফ দুখানি দুই দেয়ালে সম্মুখা-সম্মুখি টাঙ্গান রহিয়াছে। ছবির ঠিক নীচেই এক একটি কোলঙ্গা, একটি কোলঙ্গায় কিছুই নাই, কিন্তু তেলে জলে ইহার এমন অবস্থা হইয়া আছে যে, এইখানেই যে রাত্রে প্রদীপ দেবীর অধিষ্ঠান হয় পাঁজি পুঁথি হাতে না লইয়াও তাহা অনুমান করা যায়। আর একটি কোলঙ্গায় লক্ষ্মীর একটি প্রতিমূর্ত্তি, এবং গৃহের প্রকৃত লক্ষ্মীও ইহা হইতে অধিক দূরে অবস্থিত নহেন। এই কোলঙ্গার বামহাতি গৃহ-কোণেই ছোট বড় দুইটি লোহার সিন্ধুক; তাহাতে তেলসিন্দুরের নানা চিত্র থাকায় তাহার টস্‌টসে লাল রঙ্গে সহজেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাহার উপরে বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গৃহিনী প্রচুর তৃপ্তি-লাভ করেন। ছোট সিন্ধুকটির দুইটি চাবির একটি গৃহিণীর

কাছে একটি কর্ত্তার কাছে থাকে, আর বড়টির চাবি জগৎবাবু তাঁহার নিজের কাছেই রাখেন। এই ত এ গৃহের আসবাব সাজ-সরঞ্জাম। ইহা ছাড়া একখানি মাদুর আপাততঃ এই গৃহতলে শোভা পাইতেছিল বটে, কিন্তু উক্ত আসবাবগুলির মত ইনি চিরস্থায়ী বন্দবস্তরূপে এ ঘরটিকে ভোগ দখল করিতে পান না, অন্যের আবশ্যক মত একবার এ ঘরের মাটিতে পড়েন, আবার এখান হইতে উঠিয়া কুণ্ডলাকৃতিতে গৃহ-কোণের শোভা বর্দ্ধন করেন; অনবরত এইরূপ তরঙ্গের জীবন অভিনয় করিতে বাধ্য হইয়া ইনি যে বিশেষ সুখজনক জীবন বহন করিতেছেন না তাহা ইহার জীর্ণ-দশা-প্রাপ্ত কলেবর দেখিলেই সুস্পষ্ট বুঝা যায়। জগৎ বাবুর ইচ্ছামত কাজ হইলে অনেক দিন যাবৎ এই মাদুরখানি ইহার কষ্টকর কর্ত্তব্যের হাত হইতে অব্যাহতি পাইত, তাঁহার ইচ্ছায় গৃহমধ্যে শতরঞ্চ জাজিমের বিছানা হয়, কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম এখানে হইবার নহে, গৃহিণী যিনি কর্ত্তারও কর্ত্তা—তিনি ইহাতে নিতান্তই নারাজ। তিনি বলেন "ও সকল বাবুগিরি একালের মেয়েদেরই পোষায়—ও সকল তাঁহার দ্বারা হইবে না।"

জগৎ বাবু ইহার উত্তরে এক দিন বলিয়াছিলেন—"কেন তুমিত আর আয়ি ঠাকরুণ নও, তুমিও ত একেলে!"

সেই দিন হইতে এক সপ্তাহ কাল গৃহিণী জগৎ বাবুর সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন নাই, কেবল তাহা হইলেও বা রক্ষা ছিল, একদিন কথা কহিতে গিয়া চক্ষের জলের বন্যায়, জগৎ বাবুকে শুদ্ধ ভাসাইয়া ফেলিবার উপক্রম

করিয়াছিলেন। অনেক কষ্টে বাঁচিয়া তিনি সেই অবধি নাকে খৎ দিয়াছিলেন—ওরূপ কথা আর তুলিবেন না।

আমরা বলিয়াছি মাদুরখানি গৃহে শোভা পাইতেছিল, এইখানে বলা আবশ্যক, তাহার নিজের শোভায় নহে, এই মাদুরের উপর বসিয়া চারিজন রমণী তাস খেলিতেছিলেন।

জগৎ বাবুর স্ত্রীর হাতে অনেকগুলি রং আসিয়াছে, তিনি ইসারা করিয়া তাহার সাথীকে জানাইয়া দিলেন—রং খেলিলেই ঠিক হয়। সাথী রং খেলিয়া দিলেন, বেদলের একজন বলিয়া উঠিলেন—"বৌ ইসারা করেছে, রং খেলতে দেব না!"

বৌ কথা কহিতে গিয়া মাদুর জোড়া শরীর দুলাইয়া এবং বড় বড় মুক্তা পরান-নথ নাড়াইয়া বলিলেন "বেশ! ইসারা আবার কখন করলুম!" তাঁহার আট বৎসরের কন্যাটি তাঁহার পাশে বসিয়া তাস লইয়া মাঝে মাঝে নাড়া চাড়া করাতে ইতিপূর্ব্বে তিনি তাহাকে ঘর হইতে উঠিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন—তাই এতক্ষণ সে গোঁ হইয়া বসিয়াছিল, এবার তাহার প্রতিশোধের পালা, সে বলিল—"হ্যাঁ, মা যে ইসারা কল্লি",—মা ইহাতে রাগিয়া বলিলেন—"পোড়ারমুখি, এখান থেকে যা না!" মেয়ে বলিল—"না আমি যাব না"—মা বলিলেন—"এমন লক্ষীছাড়া মেয়ে দেখেছ!"

টগর মাকে যে বড় ভয় করিত তাহা নহে, কেননা মা তাহাকে যদিও যখন তখন বকিতেন, মারিতেন, কিন্তু তাহার পরেই আবার এতটা আদর দিতেন, তাহার ন্যায়ান্যায়

খেয়াল সে তখন আরো এমন অবাধে পরিতৃপ্তি করিতে পাইত যে এরূপ মার-পিঠে গৃহিণীর ক্ষণিক ক্রোধ পরিতৃপ্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কোনও লাভ ছিল না, বরঞ্চ লোকসানই সম্পূর্ণ। ইহাতে মায়ের কথার উপর টগরের অভক্তি বাড়িত, তাঁহার শাসনের আর তাহার নিকট কোন মূল্য থাকিত না, ইহাতে দিন দিন সে অধিকতর অবাধ্যতা শিক্ষা করিত। সুতরাং মা যখন তাঁহাকে বলিলেন "লক্ষ্মীছাড়া" সেও ছাড়িয়া কথা কহিল না। সে বলিল—"লক্ষ্মীছাড়া বই কি, তুই লক্ষ্মীছাড়া!" বলিয়াই সে মায়ের নিকট হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল, সে জানিত এরূপ সময়ে তাঁহার নিকটে থাকা তাহার পক্ষে বড় সুবিধার নহে। যদিও এরূপ বিবাদস্থলে গৃহিণীই প্রকৃত দোষী—কেন না তাঁহার দৃষ্টান্তই সে অনুকরণ করে মাত্র—কিন্তু গৃহিণী তাহা বুঝি-বার পাত্র নহেন। 'জোর যার মুলুক তার' এই বাক্যটির অনুসরণ করিয়া এরূপ যুদ্ধে তিনি বরাবরি একতরফা জয়-লাভ করেন। টগর দেখে মা গালাগালি দিয়া বেশ পার পাইয়া যান সে কখনো পার পায় না। মার খাইয়া তাহার যত কষ্ট না হয়—এই অবিচারে তাহার ততোধিক কষ্ট হয়।

টগর মাকে গালি দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল, আজ তাহার মা ফাঁকিতে পড়িলেন। মা যে তাস খেলা ফেলিয়া আবার তাহাকে মারিতে উঠিবেন ইহা তাহার মনে হইল না। কিন্তু টগর ভুল বুঝিয়াছিল, রাগের চোটে গৃহিণীর স্থূল শরীর-ভারও হালকা হইয়া আসিল, তিনি হাতের তাসগুলা তাড়াতাড়ি মাদুরে ফেলিয়া টগরের

নিকটে উঠিয়া আসিয়া তাহার পিঠে গুমগুম করিয়া কিল বসাইতে লাগিলেন, আর টগর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। পুরাণ বাড়ীর ঠাকুরঝি তখন 'মেরোনা মেরোনা' বলিতে বলিতে মেয়ের হাত ধরিয়া মায়ের কাছ হইতে টানিয়া লইলেন। মেয়ে সরিয়া আসিয়া মাটীতে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, ঠাকুরঝি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। মাও তখনি প্রায় নিকটে আসিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"চুপ কর্, কাঁদিসনে"। টগর তখন আরো প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল, মা বলিলেন—"লক্ষ্মী মা চুপ কর—পয়সা দেব এখন"। মায়ের কথার উপর মেয়ের ভরসা বড়ই কম—সে বলিল—"দাও পয়সা—আমি খাবার কিনবো"।

মা বলিলেন—"খাবারওয়ালী আসুক, দেব এখন!"

মেয়ে বলিল—"না, এখনি দে!"

মা আলমারি হইতে দুটি পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। সে তখন শান্ত হইয়া খাটের উপর গিয়া বসিল, গৃহিণী ও তাঁহার ঠাকুরঝিও নিশ্চিন্তভাবে পূর্ব্বেকার মত নিজ নিজ স্থান অধিকার করিলেন। আবার খেলা আরম্ভ হইল. ঠাকুরঝি তাস ভাঁজিয়া ধরিলেন—বৌ কাটাইলেন—ইস্কাবনের সাহেব। কাটাইয়া হাসিয়া বলিলেন—"ঠাকুরঝির অদৃষ্টে খেলাতেও লাল উঠে না"!

জীবনের মা গৃহিণীর সাথী এবং বৃত্তিভোগী, জীবনের পড়ার খরচ জগৎ বাবু দেন, সুতরাং গৃহিণীর পক্ষ হইয়া কথা কহিতে পারিলে তিনি ছাড়েন না, তিনি বলিলেন—

"সত্যি—নিজে লাল হয়ে যার ভাগ্যে লাল নেই তার বড়ই 'ছুরাদৃষ্ট' বলতে হবে।"

ঠাকুরঝি বলিলেন—"কালো যদি হতেম ত লাল মিলত, পৃথিবীর গতিকই ঐ, সব উল্টা পাল্টা" তিনি ঠাটাটা ঘুরাইয়া জগৎবাবুর স্ত্রীর উপর ফেলিলেন—কেন না জগৎ বাবু গৌরবর্ণ গৃহিণী শ্যামলা। গৃহিণী ইত্যবসরে রং খেলিয়া বলিলেন "আরে বাবু এই রূপেই ত ভুলেছে, আর রূপে দরকার কি? আর তোমার ভাইও ত আর ইংরেজ পুরুষ নন। দিয়ে যাও"। বৌ ভুলিয়া গেলেন "ভাই" হাজার কেন ইংরাজ পুরুষ না হউন, আর বৌ কেন স্বর্গের বিদ্যাধরী হউন না—তবু বোনের কাছে বৌ কখনও ভাইয়ের সমযোগ্য নহেন।

ঠাকুরঝি তাস দিলেন—গৃহিণীর 'যা' সম্পর্কীয় যিনি তিনি ঐ দিক হইতে বলিলেন—"দিদি, বেশ বলেছ, দেত ভাই, আরো দু কথা শুনিয়ে, ভাইয়ের গরবেই মলেন! পিট্‌টা নে।"

ঠাকুরঝি বলিলেন,—"আর তোরা যে নিজের গরবেই মলি?"

জীবনের মা বলিলেন—"কেন গরব করবে না—অমন ঘোরাল চেহারা কটা দেখেছ বল দেখি? করলে কি—দশটা দিলে? ওদের যাচ্ছে যে!"

ঠাকুরঝি। আমিত বলি—আর একটু কম ঘোরাল হলে ভাল হোত। বৌ সত্যি তুমি বড় মোটা হয়ে পড়েছ।

যা। না, মোটার জন্য না, মাথায় টাক পড়ে দিদি এখন খারাপ হয়ে গেছে—

জীবনের মা। আর বর্ণ টাও একটু মলিন হয়ে পড়েছে।

গৃহিণী বলিলেন—"মাও সে দিন বলছিলেন যে, আমার তারার আর সে বর্ণ নেই, সে চেহারা নেই, না টগর?"

ঠাকুরঝি। কিন্তু আমরাত বাপু বর্ণ চিরকালই একই দেখছি—তবে ছেলেবেলার কথা বলতে পারিনে।

টগর এতক্ষণ খাটে বসিয়া পয়সা লইয়া খেলিতেছিল, সে বলিল—"তাই বুঝি! দিদিমা বলছিল মা শুকিয়ে গেছে! দিদিমা কবে আসবে, মা? আমার পুতুল—"

ঠাকুরঝি হাসিয়া বলিলেন "বৌ, তুই তবে আরো একটু মোটা হ? তোর সরু মুখে নত মানায় নি—কেমন?"

জীবনের মা বলিলেন—"ও মুখে নথ মানায় নি!—তো মানিয়েছে কোথা?"

গৃহিণী আর কিছু বলিলেন না, কেবল একটু আহ্লাদের হাসি হাসিলেন, আর চোখ নীচু করিয়া একবার নথের দিকে তাকাইলেন। গৃহিণীর বয়স যদিও ৩০।৩২ এর অধিক নয়, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহাকে একালের মেয়ে বলিলে তিনি বড় রাগ করেন, আর আসলেও ধরণধারণ চাল চলন তাঁহার সকলই সেকালের মত সুতরাং তাঁহার মাথা-পোরা সিন্দূরে ও মুখভরা নথে তাঁহাকে মানায় বলিলে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন। একালের নব্য মেয়েদের নথে-খোঁটা সিন্দূর পরা, নথহীন মুখ, আর জামা জোড়া আঁটা শরীর দেখিলে তিনি জ্বলিয়া যাইতেন—এমন কি তাঁহার মেয়েকে তিনি পূজা পার্ব্বনের সময় ইংরাজি ফ্রক ও বনেট পরাইয়া নিমন্ত্রণে পাঠাইতে আপত্তি করিতেন না বটে, কিন্তু

জগৎ বাবু যদি বলিতেন, 'টগরকে ফ্রক না পরাইয়া সাড়ীর সঙ্গে জ্যাকেট প্রভৃতি পরাইয়া দাও'—তাহা হইলেই তিনি সমস্ত দিন গন্ গন্ করিতে থাকিতেন, তাঁহার মনে হইত জগৎ বাবু মেয়েকে মেম করিয়া ফেলিবেন, তাঁহাকে ত অনেক করিয়া মেম করিতে পারেন নাই, বুঝি সেই শোধ মেয়ের উপর দিয়া তুলিবেন। এই সব খুঁটি নাটি লইয়া তাঁহাদের অনবরত ঝগড়া চলিত, বলা বাহুল্য অবশেষে গিন্নিই জয়ী হইতেন।

জীবনের মা দেখিলেন গৃহিণী তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তিনি আবার বলিলেন—"মুক্তা দেওয়া নথটি মুখের উপর পড়েছে আর পান খেয়ে ঠোঁট দুটি টুক টুক করছে—কেমন মানিয়েছে বল দেখি ?"

গৃহিণীর যা বলিল—"দিদি, তুমি একলাই যে পান গুলো ফুরোলে, পান কৈ ?"

গৃহিণী তখন 'তারার মা' 'হাবার মা' করিয়া বার কতক ডাকিলেন—সাড়া না পাইয়া মেয়েকে বলিলেন,—"মা, যাও গোটা কতক পান সেজে আন তো ?"

মেয়ে বলিল—"আমি পারিনে !"

গৃহিণী বলিলেন—"আবার দুষ্টুমি।"

মেয়ে বলিল—"সব কথা আমাকে! কেন কণেদিদিকে বল না।"

গৃহিণী বলিলেন—"সত্যি! সে যে কোথায় তার ঠিক নেই। রাতদিনই কি খেলা করে বেড়াবে? ডাক্ত তাকে।"

টগর ইহাতে আপত্তি করিল না—উঠিয়া "কণেদিদি

কমেদিদি" করিয়া ডাকিতে লাগিল—উত্তর হইল 'যাই'। অল্প ক্ষণের মধ্যেই একটি কৃশকায় বালিকা এই গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। টগর তীব্রস্বরে বলিল "এতক্ষণ কোথায় ছিলি? সেই অবধি মা পান পায় নি।" অন্য সময় হইলে গৃহিণীর স্বর টগর হইতেও সুতীব্র হইয়া উঠিত, কিন্তু এত লোক জনের সাক্ষাতে সেটা ভাল দেখায় না, সুতরাং গৃহিণী চাপা রাগিণীতে স্বর টানিয়া বলিলেন "সারাদিনই কি খেলা করবি বাছা, দেখছিস লোকজন এয়েছে, এদিকে একবার আসতে হয়। গোটা কতক পান নিয়ে এস।"

বালিকা অল্পক্ষণের মধ্যেই পান লইয়া আসিল। গৃহিণী তখন বলিলেন—"দেখ্ বাছা, তিন খানা জলখাবারের জায়গা করে আয় দেখি।"

বালিকা চলিয়া গেল, টগর চীৎকার করিয়া বলিল "দিদি, আমাকে আগে এক গেলাশ জল দিয়ে যা।"

বালিকা তাহার জন্য জল লইয়া আসিল, তাহার খাওয়া হইলে গ্লাস লইয়া চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে খেলোয়ারদের একখানা ছক্কা হইল, জগৎ বাবুর স্ত্রীই জিতিলেন, জিতিয়া রহস্যচ্ছলে ছক্কা খানি বেদলের ঠাকুর জামাই ও দেবরকে ভাগে খাদ্যোপহার প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের উত্তমার্দ্ধ-দিগকে আসল খাদ্য দিবার মানস করিতেছেন—এমন সময় শ্যামী ঘটকী এই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্যামী ঘটকী জাতিতে কায়স্থ—ব্যবসায় ধরিয়াছে ব্রাহ্মণের। কিন্তু ব্যবসায়ের মান সে বেশ বজায় রাখিয়াছে। তাহার হৃষ্টপুষ্ট শরীর, তাহার লম্বা লম্বা পা ফেলিবার ভঙ্গী তাহার 'গঙ্গাগিরি' বাঁধনীর কথা বার্ত্তা সমস্তই 'আমি একজন' ভাবে পূর্ণ। শ্যামী সধবা কি বিধবা বলা যায় না—তাহার মাথায় সিন্দূর নাই—কিন্তু হাতে রুলি ও পরণে চওড়া লালপেড়ে সাড়ি। সে সদর্পে গৃহে প্রবেশ করিয়া মাদুরের নিকট ঊর্দ্ধ-জানু হইয়া বসিয়া বলিল—"বলি বৌ মা, ডেকেছিলে কেন ?"

সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই বিবাহের গল্প করিতে ভালবাসে, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা ইহা পাইলে ত আর কিছুই চাহেন না।

গৃহিণীর অনুরোধে তখন তাঁহার আত্মীয়াগণ অন্য গৃহে আহারে যাইবার জন্য কেহ বা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কেহ বা খাইতে আপত্তি করায় গৃহিণী তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আতিথ্য গ্রহণের ঔচিত্য বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিতেছিলেন—ঘটকী আসায় এ সকলি বন্ধ হইল; যিনি উঠিয়াছিলেন তিনি ত তখনি বসিয়া পড়িলেন, গৃহিণীও আতিথ্যের অনুনয় ভুলিয়া গিয়া আত্মীয়ার হাত ছাড়িয়া দিলেন, এবং আবার রীতিমত মাদুরে আড্ডা জমাইয়া বসিয়া ঘটকীকে বলিলেন,

"এত দিন কি আর আসতে নেই ঘটক ঠাকুরুণ?"

ঘটকী বলিল—"কাজ থাকে ত আসি—এই ত কমাস আগে এলুম তা বিয়ের নাম করলেই বাবু রেগে আগুণ। তোমরা মেয়ের বে দেবে না ত তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে থাক, আমি আর এসে কি করব। তা ডাকলে যে আবার? বাবুর মত হয়েছে নাকি?"

গৃ। বাবুর কথা রেখে দাও—ওর কথায় সব কাজ করলেই হয়েছে।

ঘটকী। তা এই বুঝি মেয়ে?

গৃ। না গো না এটি এখন না, পরের মেয়ে যেটিকে ঘরে রেখেছি—আগে সেইটির সম্বন্ধ কর, কি বল ভাই? পরের মেয়ে রেখে আপনার মেয়ের আগে সম্বন্ধ করা কি ভাল?

জীবনের মা বলিলেন—"বৌদিদির আমাদের ধর্ম্মের শরীর।"

ঘটকী বলিল—"তোমার ছেলের সঙ্গে তাহলে আর হোল না?"

গৃ। ছেলের সঙ্গে? পোড়া কপাল! বাপ মা খেকো-মেয়ে, ওর সঙ্গে ছেলের বিয়ে!

ঠাকুরঝি। জ্যাঠাইমার কিন্তু বড় ইচ্ছা ছিল—তিনি ত 'কনে কনে' করে ডাকতেন।

মা। বড় ঠাকুরেরও শুনতে পাই নাকি ঐ ইচ্ছা।

গৃ। তা ইচ্ছা হ'লে কি করব? আমি কিন্তু আমার ছেলের বিয়ে ওর সঙ্গে দেব না।

ঘটকী। তবে ওরি সম্বন্ধ আগে? তা দেবে থোবে কি বল? বাপ মা-খেকো মেয়ে, বুঝে দেখো অমনি হবে না।

গৃহিনীর মাথার কাপড় একটু সরিয়া পড়িয়াছিল—তিনি বাঁ হাত দিয়া টাক ঢাকিয়া মুখ নাড়িয়া বলিলেন, "বাছা পরের মেয়েকে এতদিন খাওয়ালুম পরালুম মানুষ করলুম, আবার বিয়ে থাওয়াও দেব—কিন্তু তাই বলে ত ওর উপর সর্ব্বস্ব ঢালতে পারিনে, আমাদের নিজের‌ও ছেলে মেয়ে ত আছে।"

এইখানে বলা আবশ্যক উল্লিখিত কন্যাটি বৎসর দুই মাত্র জগৎ বাবুর পরিবার ভুক্ত হইয়াছে।

ঘটকী। তা হলে কিন্তু ভাল ঘরে বর মিলবে না, তাতে কি বাবু রাজি হবেন?

গৃ। রাজার ঘর আর কে চাচ্ছে? অমনি গৃহস্থ ঘর হলেই চলবে। আর আমরা যে কিছুই দেব না তাও ত নয়। গহনা পত্রও দেব, নগদ টাকাও কিছু দেব। (গৃহিনীর ইচ্ছায় কর্ম্ম হইলে অবশ্য এরূপ হইত না কিন্তু তিনি বেশ জানিতেন এস্থলে জগৎ বাবু তাঁহার কথা সম্পূর্ণ শুনিবেন না) তবে আমার মেয়েটিকে যেমন দেব তেমনটি কি আর এ'কে দিতে পারব—কি বল ভাই তোমরা?

ঘটকী। তোমার মেয়ে হলে ত কথাই নেই, মুখের কথা বার করতে না করতে তাহলে দুশো বর জুটে যায়।

ঠাকুরঝি। কেন ঘটক ঠাকরুণ, ও মেয়েটিওত দেখতে মন্দ নয়, তবে কেবল পয়সা নেই এই যা বল, আমার ছেলে থাকলে আমি বিয়ে দিতুম, দিব্যি মেয়েটি।

জীবনের মাও মনে মনে মেয়েটিকে বৌ করিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন, কেবল কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না, কি জানি গিন্নি আবার কি মনে করেন।

ঘটকী বলিল "আজ কাল স্থন্দর আর কালো নেই, আজ কাল কেবল রেস্ত।"

গৃহিণীর যা বলিলেন—"কিন্তু দিব্যি মেয়েটি।"

গৃহিণী বলিলেন—"কিন্তু আমাদের টগরের মত ত আর নয়! রংখানা ফ্যাকাসে হলেইত হয় না, কি বল ঘটক ঠাকরুণ?"

ঘটকী। তা বৈ কি, এ মেয়ের নাক মুখ ঠিক যেন পটের রাধিকা ঠাকরুণ, আর গড়ন পিটনও কেমন গোল গাল।

'পটের রাধিকা ঠাকরুণ'! আমাদের এ তুলনাটা মনে আসিত না স্বীকার করি—কিন্তু কথাটা নিতান্ত মন্দ বলে নাই। পটের ছবির মত টগরের 'পটল চেরা চক্ষু' নহে বটে, কিন্তু তাহার ছোট কপাল, জোড়া ভ্রু, তীক্ষ্ণ নাসা, ভারী ভারী মানানসই মুখ—সম্ভবতঃ পটকারগণ আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিত। তবে ইহা সত্ত্বেও এক বিষয়ে এ তুলনাটা আমাদের সঙ্গত মনে হয় না। পটের রাধিকার মুখে কোন একটা ভাব পাওয়া যায় না—তাহাতে যদি কোন ভাব থাকে ত একটা ভোঁতাভাব অর্থাৎ কোন ভাবের অভাবের ভাব, কিন্তু টগরের মুখের আর যে দোষই থাক এ দোষ নাই, তাহার সমস্ত মুখে একটি ধারাল রুক্ষ ভাব পরিব্যাপ্ত। যদি তাহার চুলগুলি শিথিল ভাবে কপালে পড়িয়া

থাকিত, তাহা হইলে হয়ত এই রুক্ষ ভাব অনেকটা কোমল-তর হইতে পারিত, কিন্তু তাহার আঁটিয়া-বাঁধা খোঁপার দোষে ইহার মধ্যেই তাহার সিঁথি ফাঁক হইতে আরম্ভ হইয়া-ছিল, আর সেই আট বৎসরের বালিকার কচি মুখ আঁটির মত পাকা দেখাইতেছিল। কিন্তু ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি। গৃহিণীর আবার অন্য কোনও রকম চুলবাঁধা পছন্দ হয় না। তিনি স্নেহলতাকে দিয়া গৃহের সকল কাজই করান—কেবল তাহাকে টগরের চুল বাঁধিতে দেন না,—কেননা সে তাঁহার মত অমন আঁটিয়া বাঁধিতে পারে না। চুল বাঁধিবার এই অপূর্ব্ব কৌশল গৃহিণী যে নিজের মধ্যেই চিরদিন আবদ্ধ রাখিবেন এমন অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না, স্নেহলতাকে উহা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কিছুমাত্র চেষ্টা যত্নের ত্রুটি করেন নাই, তাহাকে কাছে বসাইয়া এমন কতদিন টগরের চুল বাঁধিয়া দিয়াছেন—কিন্তু কিছুতেই কি সে শিখিবে না! সে চুল বাঁধিতে গেলেই কি আলগা বাঁধিয়া বসিবে! ১০ বৎসরের মাগী হইতে চলিল এইটুকু কি তাহার আর গায়ে জোর নাই. সব দুষ্টামি! তাহার মতলব খানা এই যে নিজের মত টগরকেও বিশ্রী করিয়া সাজান আর বিবি করিয়া তোলা, ইহা আর গৃহিণীর বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু জগৎ বাবুর মত বোকা কি তোমরা সংসারে দেখিয়াছ! তিনি যদি ইহা কিছুতেই বোঝেন! তাহা যেন নাই বুঝি-লেন একটু কি ছাই তাঁহার পছন্দও নাই? স্নেহলতা যে দিন টগরের বিশ্রী করিয়া চুল বাঁধিয়া দেয় সেই দিন কি না তিনি প্রশংসা করেন! পোড়াকপাল অমন প্রশংসার!

তাই ছাই শুধু প্রশংসা করিয়াই চুপ করুন, তাহা না— তিনি আবার গৃহিনীর চুল বাঁধার দোষ ধরেন! বলেন কি না— "আর কিছুদিন ঐরূপ আঁটিয়া-বাঁধা চলিলে গৃহিনীর মত টগরের মাথায়ও টাক পড়িবে,—একথা শুনিয়া গৃহিনীর পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি আগে যদিই বা কখনো দুই এক দিন স্নেহলতাকে টগরের চুল বাঁধিতে দিতেন, তাহাব পর হইতে সে টগরের মাথায় হাত পর্য্যন্ত দিতে পাইত না, সহস্র কাজ ফেলিয়াও গৃহিনী নিজে টগরের চুল বাঁধিতেন। টগরেরও আঁট চুলবাঁধা এত অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, মা না বাঁধিয়া দিলে তাহারও আর পছন্দ হইত না।

আপাততঃ টগরের রূপের প্রশংসায় তাহার দিকে সকলের চোখ পড়িল—যে হাসিয়া মায়ের পিঠে মুখ লুকাইল;—ঘটকী আসিতেই আবার সে মায়ের কাছে আসিয়া বসিয়াছিল। এই সময় স্নেহলতা গৃহে আসিয়া বলিল "অনেকক্ষণ জলখাবার ঠিক হয়েছে।" গৃহিনী তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন "দেখেছ কি লম্বা হয়েছে! গায়ে মাংস নেই— দিন দিন কেবল তালগাছ হচ্ছে"! যেন ইহাও তাহার দোষ, ইচ্ছা করিলে সে লম্বা না হইয়া মোটা হইতে পারিত। সকলেই তাহার দিকে চাহিল। দুই বালিকার মধ্যে কি প্রভেদ! স্নেহলতা সত্যই তন্বঙ্গী—বয়স অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ - কিন্তু তাহাতে তাহাকে বরঞ্চ ভালই দেখাইতেছিল; তাহার দেহ সুগঠিত, সুকোমল-ভাবপূর্ণ; তাহার প্রতি অঙ্গুলীতে কোমলতা বিরাজিত, মুখশ্রী খুঁটাইয়া

দেখিলে টগরকে হয়ত সমালোচিকাগণ নিখুঁৎ বলিবেন, কেননা স্নেহলতার নাক টগরের মত ধারাল নহে, তাহার ভ্রু অমন কাল কুচকুচে নহে, তাহার কপালঁ একটু বড়, কিন্তু ছোট ছোট কাল চুলের রাশ কপালখানির আশ পাশে শিথিল ভাবে শুইয়া পড়িয়াছিল, চোখে একটি করুণ ভাব, বয়সের অপেক্ষা একটা গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইতেছিল, আর তাহার প্রশান্ত, অতি স্নিগ্ধ, ম্লান পাণ্ডুবর্ণ—সমস্ত মুখে একটি কোমল লাবণ্য প্রদান করিয়াছিল। মাটিমাখা জুঁই-ফুল হঠাৎ যেমন চোখে পড়ে না—কিন্তু একবার চোখে পড়িলে তখন তাহার ম্লান সৌন্দর্য্য যেরূপ হৃদয় দ্রব করে—স্নেহলতাকে দেখিয়া সেইরূপ সকলে আর্দ্র হইল। ঘটকী বলিল "মেয়ে রূপসী বটে—নাতনি! বর মিলবে লো মিলবে!"

কথাটা স্নেহলতার দিকে চাহিয়াই ঘটকী বলিল—সুতরাং স্নেহ লজ্জিত ভাবে সেখান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল, এই সময় টগর নিকটে আসিয়া বলিল,—"দিদি তোর হাতে কি বই, আমার বই নিয়েছিস বুঝি?" বলিয়াই সে চিলের মতন তাহার হাতের উপর ছোঁ মারিল। কিন্তু স্নেহলতা বইখানি বেশ আঁটিয়া ধরিয়াছিল, সুতরাং সে কাড়িতে পারিল না; কেবল স্নেহলতা আরো সাবধান হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,—"না টগর, আমার বই" বলিয়া সে তাহাকে ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল—টগরও কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পশ্চাৎ ছুটিল, গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন "রকম দেখ না! মেয়েকে কাঁদায় দেখ! দেনা বই খানা,—

সত্যিইত কদ্দিন থেকে ওর বইখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাইত ভাবি রোজ বই-ই এত কোথায় যায়—দে বলছি!"

স্নেহলতা বলিল "না মাসিমা আমি দেব না এ আমার বই, টগর এখনি ছিঁড়ে দেবে,—এই দেখ আমার নাম"—সে নাম দেখাইতে যেমন বই নীচু করিল অমনি টগর তাহা ধরিল, দুই জনে টানাটানি করিতে করিতে বইয়ের মলাট আধখানা ছিঁড়িয়া গেল, আর আধখানা ছিঁড়িবার ভয়ে স্নেহলতার হাত সহসা আপনি আলগা হইয়া পড়িল, অমনি টগর বইখানি টানিয়া লইল। লইয়াই সে মায়ের কাছে পলাইল। স্নেহলতার অত্যন্ত রাগ হইল, কিন্তু নিরুপায়-ক্রোধে তাহার দুই চক্ষু কেবল জলে ভরিয়া গেল, সে কাঁদিয়া বলিল "মাসিমা, আমার বই, টগর কেন নেবে?"

ঠাকুরঝি বলিলেন "বাছা টগর—তুমি কেন ওর বইখানি নিলে"—

গৃহিণী বলিলেন "ওনার বই! যেন বাপের বাড়ী থেকে নয়ে এসেছেন!"

স্নেহলতা আর ইহার উপর হঠাৎ কোন কথা কহিতে পারিল না, তাহার চোখের জল আরো উথলিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝি বলিলেন "বৌ, তুমি কি ক্ষেপেছ? ছেলে-মানুষকে নিয়ে এত কেন?"

গৃহিণী আবার বলিলেন "একখানা বইয়ের জন্যে এত! আজকাল যে কি হয়েছে—যেন সব পাগড়ি বেঁধে আফিসে যাবে!" স্নেহলতা ফুলিয়া ফুলিয়া বলিল "মাসিমা আজ

আমার এখনি পড়া মুখস্থ করতে হবে, মেসমশাই এসে পড়া নেবেন বলেছেন।"

গৃহিণী। পড়া নেবেন? মিন্সে যেন হতবুদ্ধি হয়েছে, বিয়ের বর খোঁজ—ধেড়ে মেয়ে হয়ে উঠলো—তা নয়! নেকা পড়া নিয়ে কি ধুয়ে খাবে নাকি!"

এই সময় একটি বালক এই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল—গোলমাল দেখিয়া বলিল, "কি হয়েছে"?

টগর বই হাতে করিয়া একটু যেন ভয়ে ভয়ে মায়ের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। স্নেহলতা বলিল "চারু, টগর আমার বই নিয়েছে"।

টগর বলিল, "না, আমার বই"!

চারু বলিল "আচ্ছা কার দেখি?" বলিয়া—টগরের চীৎকার ও বল প্রকাশ এবং গৃহিণীর অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও বই-খানি টগরের হাত হইতে কাড়িয়া লইল এবং স্নেহলতার বই দেখিয়া তাহাকে প্রদান করিল। কিন্তু এই হুড়ামুড়িতে বালকের হাতের কুনাই লাগিয়া টেবিলের ঘড়িটি নীচে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে হাহুতাশ করিয়া উঠিল; টগর কেবল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বেশ হয়েছে, আমি বাবাকে বলে দেব কে ভেঙেছে।"

বালক বলিল, "তাহলে আমি বলে দেব তুই স্নেহের বই ছিঁড়েছিস—আর লজঞ্জুস দেব না।"

টগর বলিল, "তবে দাও লজঞ্জুস।"

চারু পকেট হইতে লজঞ্জুস বাহির করিয়া দুই বালিকাকেই কিছু কিছু প্রদান করিল তাহার পর বলিল "মা খাবার"?

স্নেহ বলিল "চারু, ছোট ঘরে তোমার খাবার গুচিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখেছি; চল, দিয়ে আসি।" চারু বালিকার সহিত চলিয়া গেল। গৃহিনী বলিলেন—"দেখেছ একগুঁয়ে মেয়ে—মেয়েটাকে কাঁদালে—ঘড়িটা ভাঙলে—এক খানা বই নিয়ে কত কাণ্ডই করলে!"

ঠাকুরঝি বলিলেন, "মেয়েটির দেখছি পড়ায় বেশ মন আছে।"

গৃহিনী বলিলেন "তাও কি আমাদের টগরের মত? এর মধ্যে টগরকে কত বই যে আনিয়া দিয়েছি তার ঠিক নেই। আমি বলি—অত পড়ে কি হবে, চাকরী ত আর করবিনে—তা বাছা শুনবে না—বুঝি 'লীলাবতী' হবেন!"

টগর বলিল—"মা, বাবা জিজ্ঞেস করলে কি বলবো?"

গৃহিনী। কি আবার জিজ্ঞেস করবে?

টগর। এই ঘড়ির কথা।

মা বলিলেন, "বলিস এখন, আপনি ভেঙ্গেছে। নইলে বাছা তোর দাদাকে বকবে যে,—ও কথা কি বলে?"

আবার নুতন করিয়া স্নেহলতার উপর ক্রোধের ঝাল ঝাড়িতে ঝাড়িতে গৃহিনী আত্মীয়াগণকে লইয়া জল খাবার ঘরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জগৎ বাবু সচরাচর সন্ধ্যার বড় বেশী আগে বাড়ী আসিতেন না; আজ একটু শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী ফিরিলেন। স্নেহলতা কাজ কর্ম্ম সারিয়া প্রতিদিনকার মত অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটীর বারান্দা গৃহের একটি বন্ধ জানালার খড়খড়ি খুলিয়া তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া তাহার আর আনন্দ ধরিল না। জগৎ বাবুর মা মরিয়া গিয়া অবধি জগৎ বাবুই স্নেহলতার পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু সব, সুতরাং এ বাড়ীর মধ্যে জগৎ বাবু স্নেহলতার জীবনের যেমন আবশ্যক—এমন আর কাহারো নহেন। জগৎ বাবু বারান্দায় আসিবামাত্র সে প্রফুল্ল মুখে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল—"মেসমশায়, আজ ত তুমি বেশ শীগ্‌গির এসেছ, রোজ কেন এমনি আস না?"

জগৎ বাবুর ডান হাত বেদখলে, তিনি বাঁ হাত দিয়াই স্নেহলতার গালে আস্তে আস্তে চড় মারিয়া হাসিয়া বলিলেন—"লতির আমার এমনি মতলবখানাই বটে! কিন্তু এক দিন শীগ্‌গির এলে রোজই যে আসতে হবে—এ কোন শাস্ত্রে পেলি বল দেখি বুড়ি?"

বুড়ি তাঁহার কথার উত্তরে কেবল একটু হাসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

এই সময় টগরও এই বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত

হইল, এবং জগৎ বাবুকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া তাঁহার বাকী হাতটা পাকড়া করিল, জগৎ বাবু উভয়ের মধ্যে যষ্ঠী বুড়ি হইয়া অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। এরূপ আনন্দের সময় মুখ বন্ধ রাখিলে স্নেহলতার আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না—সে চলিতে চলিতে বলিল "মেসমশায়, আজ আমি নিজের হাতে মোহনভোগ তৈরি করেছি।"

টগর বলিল "অ্যাঁ কণে-দিদি! হারার মা যে সেখানে দাঁড়িয়েছিল!" স্নেহলতা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ হারার মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল,—নইলে আমি কাঁচা থাকতেই নামাচ্ছিলুম। সে কিন্তু নাড়াচাড়া করেনি। সবটা খেতে হবে কিন্তু মেসমশায়।"

জগৎ বাবু বলিলেন "তাহলে কি দিবি বল?"

স্নেহ। কি দেব? আরো খানিকটা মোহনভোগ। তাও কিন্তু খেতে হবে।

জগৎ। তাও খেতে হবে!

স্নেহলতা। হ্যাঁ—তা পর একটা পান দেব।

জগৎ। পান যেন দিবি—অত খেয়ে প্রাণটা যদি যায় তাত আর ফিরে দিতে পারবিনে বুড়ি?

টগর। মা বাবা তুমি অত মোহনভোগ খেয়োনা তাহলে লুচি খেতে পারবে না। তাহলে মা রাগ করবে আর তুমি বকুনি খাবে—

জগৎ বাবু বলিলেন—"বেশ মনে করিয়ে দিয়েছিস বুড়ি ঐটে ছাড়া আমি আর সব খেতে রাজি আছি—"

টগর খুব হাসিল, কিন্তু স্নেহলতার হাসি আসিয়া অধর

প্রান্তে তাহা মিলাইয়া গেল, বকুনি খাওয়াটা যে কি বিষম ব্যাপার তাহা সে বেশ জানিত, সুতরাং সেটা সে হাস্যজনক বলিয়া অনুভব করিল না।

জগৎবাবু বাড়ী আসিয়া বাহিরে মুখ হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া লইয়াছিলেন; বাড়ীর মধ্যে আসিয়াই খাইতে বসিলেন। স্নেহলতা তাঁহার আহারের সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিল, তিনি আসনে বসিলে তাঁহার সম্মুখে খাদ্যাদি ধরিয়া দিয়া নিকটে বসিল। গৃহিণী তখন সে ঘরে ছিলেন না—টগর বারান্দায় গিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—"মা, উপরে আয়; বাবা এয়েছে।"

জগৎ বাবু এত সকাল সকাল প্রায় আসেন না, সুতরাং গৃহিণী ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি যখন কাপড় ছাড়িয়া উপরে আসিলেন—তখন জগৎ বাবুর খাওয়া শেষ হইয়াছে—তিনি জল খাইতেছেন। কিন্তু গৃহিণী দেখিলেন তখনও তাঁহার পাতে দুই খানা লুচি ও দেড়খানা আন্দাজ সন্দেশ পড়িয়া আছে। তিনি লুচির থালা হইতে স্নেহলতার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন "বলি একটু আগে কি ডাক্‌তে নাই—আজ দেখছি কিছু খাওয়া হয়নি। (জগৎ বাবুর প্রতি) ওই মনো-হারাটা খাওনা—আমার মা পাঠিয়াছেন।"

জগৎ বাবু দেখিলেন আবার অনুনয়ের পালা আরম্ভ হইল, এ পালাটাকে যদি তিনি একবার জমিতে দেন তাহা হইলে গৃহিণী তাঁহাকে ঐ দুখানা লুচি ও সন্দেশ না

খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না। তিনি যদি বা দু এক মিনিট আসনে বসিয়া থাকিতেন,—ইহার পর তাহাতে আর সাহস না করিয়া তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন—"অসার খলু সংসারে শ্বশুর মন্দিরের সবই সার, তাকি আর জানিনে গিন্নি—একটা আস্ত সন্দেশইত খেয়েছি তবু অপরাধী!—"

গৃহিণী তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না,—মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া বলিলেন—"একটা খেলে কি আর দুট খেতে নেই? তোমাদের কেমন যে জিনিস নষ্ট করা অভ্যাস! যেন সব ধূলো, ধূলো—যত রাখ যত ফ্যালো, কিছুর আর দরদাম নেই।"

জগৎ বাবু মাথা চুলকাইয়া মনে মনে বলিলেন "কিন্তু জীবনের দরটাও একবারত ভাবিতে হয়।" প্রকাশ্যে কিন্তু আর কোন কথা কহিতে সাহস না করিয়া ত্রস্তে বারান্দায় সরিয়া পড়িলেন। সেখানে চাকর গাড়ু গামছা লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। গৃহিণীর যদিও কাজে কাজেই তখন তাঁহার আশা ছাড়িতে হইল কিন্তু সেই নষ্ট খাদ্যের উদ্ধারের আশা তখনো ছাড়িতে না পারিয়া টগরকে বলিলেন—"অত খাবার নষ্ট কেন হবে, তুই পাতে বস্।"

দুঃখের মধ্যে টগরেরও আবার তখন 'ক্ষিধে' ছিল না, পূর্ব্বেই সে তাহার লুচির ভাগ শেষ করিয়া আসিয়াছিল,—সুতরাং সেও গৃহিণীর প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায় তিনি মহা ক্ষাপা হইয়া উঠিলেন। জগৎ বাবুর দৃষ্টান্তে ও আদরে যে

মেয়েগুলোর ইহকাল পরকাল খাওয়া যাইতেছে এই ভাবিয়া তিনি কোন কালেই সুস্থির ছিলেন না; এখন এই দুঃখে তিনি মাথামুড় খুঁড়িয়া মরিতে পর্য্যন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন টগর তাঁহার এই নিদারুণ মর্ম্ম যাতনাতেও সম্যক ঔদাসিন্য প্রকাশ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত তখন কথাবার্ত্তা ছাড়িয়া, টগরের হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিতে টানিতে জগৎ বাবুর আসনে বসাইয়া দিলেন, এবং কোন ওজর আপত্তি না শুনিয়া লুচি সন্দেশের ডাল পাকাইয়া তাহার মুখের মধ্যে ঠাসিয়া ধরিলেন। এইরূপ জোর জবরদস্তিতে বাধ্য হইয়া কিম্বা মিষ্টের স্বাদে বশীভূত হইয়া অথবা এই দুই কারণেরই চাপের মধ্যে পড়িয়া—যে জন্যই হৌক ইহার পর লক্ষ্মীটির মত টগরও তাহার মুখের লুচি শেষ করিয়া ফেলিল—এবং ফিরে বার গৃহিনী যখন তাহাকে খাওয়াইতে গেলেন তখন তাহাতে আর কোন ওজর আপত্তি করিল না, গৃহিনী তখন নির্ব্বিবাদে সেই লুচি দুইখানা ও দেড়খানা সন্দেশের সদগতি করিয়া এক রকম নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, কারণ সেই ভূতপূর্ব্ব ভুক্তাবশিষ্টের সম্ভাবিত অকল্যাণ ভয় তখনো তাঁহার কল্পনায় জাগিতে লাগিল, আর যত নষ্টের গোড়া সেই স্নেহলতাটা, বাবু আসিতেই ঠিক সময়ে তাঁহাকে ডাকে নাই বলিয়া তখনো গন্ গন্ করিতে লাগিলেন।

এদিকে জগৎ বাবু আহারান্তে হাত মুখ ধুইয়া একেবারে শয়নকক্ষে পলাতক হইয়াছিলেন। সেখানে কৌচে শুইয়া তিনি গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন, স্নেহলতা তাঁহার মাথার

কাছে একটা টুলে বসিয়া পাকাচুল তুলিতেছিল আর যা খুসী বকিয়া যাইতেছিল, জগৎ বাবু চোখ বুজিয়া হাঁ—হুঁ করিয়া সায় দিয়া যাইতেছিলেন। গৃহিণী টগরকে খাওয়াইয়া এই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং জগৎ বাবুর পায়ের কাছে কৌচে বসিয়া বলিলেন "বলি ঘুমচ্ছ নাকি?" জগৎ বাবু বলিলেন—'না'। টগর গৃহিণীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল, সে বলিল—"বাবা এমন চোখ বুজে থাকে, ঠিক যেন ঘুমোয়।" গৃহিণী স্নেহলতার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ভাঁড়ার দিবিনে বাছা।" সে বলিল—"আমার ভাঁড়ার দেওয়া হ'য়ে গেছে।"

গৃহিণী। ভাঁড়ার দেওয়া হয়েছে—তা আর কি কাজ নেই—যা টগরের চুল বেঁধে দিগে।

স্নেহলতা ইহাতে বড় কম আশ্চর্য্য হইল না, টগরের চুলে স্নেহলতাকে হাত দিতে দেখিলে গৃহিণী ক্ষেপিয়া উঠেন, আর আজ একি কথা! অন্য সময় হইলে সে বড়ই আহ্লাদিত হইত কিন্তু আপাততঃ জগৎ বাবুর কাছ ছাড়িয়া যাইতে তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি বলিয়া কাটাইবে ভাবিয়া পাইতেছিল না এমন সময় টগর তাহাকে অব্যাহতি দিয়া বলিল—"না দিদির কাছে আমি চুল বাঁধবো না।"—তখন সে বলিল—"টগর চুল বাঁধবে না।" গৃহিণী বলিলেন—"দেখছ এক গুঁয়ে! কিছুতেই যাবে না।"

জগৎ বাবু বুঝিলেন—গৃহিণীর কি কথা আছে মেয়েদের তাড়াইতে চান—তিনি স্নেহলতাকে বলিলেন—"লতি, তুই ত বেশ চুল বাঁধিস, আজ দে দেখি টগরের বেঁধে। টগর, যা

বুড়ি, ওঘরে গিয়ে দিদির কাছে চুল বাঁধ্‌গে। যাও স্নেহ ওকে নিয়ে যাও।" টগর তখন আর কোন ওজর আপত্তি করিল না, স্নেহ তাহাকে লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে জগৎ বাবু গৃহিণীকে বলিলেন—"উহা-দের স্পষ্ট করিয়া বলিলেই ত হইত 'তোমরা যাও'। অত ঘোর প্যাঁচ করিয়া বলিলে কি উহারা বোঝে—না বোঝাটাই ভাল?"

গৃহিণী বলিলেন—"না আমি যা বলি কিছুই ভাল নয়? কি করে আর স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে হয়। তুমি কেবল আমারি দোষ দেখ।"

জগৎ বাবু দেখিলেন—বেশী কথা কহিলে উল্টা উৎপত্তি হইবে, তিনি ওকথা ছাড়িয়া বলিলেন—"কি কথাটা বলিবে এখন বল দেখি?"

গৃহিণী বলিলেন—"বলি কত দিন আর আয়বুড়ো রাখবে, আর ত আমার মুখ দেখাবার যো নেই, এই ও বাড়ীর ওরা কত কথা বল্লে, সে সব ত আর তোমার শুনতে হয় না।"

জগৎ বাবু বলিলেন—"এই ত সবে দশ বছর বয়স—এর মধ্যেই এত কথা!"

গৃ। দশ বছর কি কম? আর দেখতে ত ১৬ বছরের মাগী হয়েছে।

জগৎ বাবু বলিলেন—"নিতান্তই যদি এত শীঘ্র বিয়ে দিতে চাও ত উদ্যোগ করতে হয়। তবে আমার ইচ্ছা ছিল—চারু আর একটু বড় হোক।"

গৃহিণীর নথস্মুদ্ধ নাক ফুলিয়া উঠিল, বলিলেন—"দেখ আমি স্পষ্ট বলছি চারুর সঙ্গে ওর বিয়ে হবে না—তা যদি দাও ত আমি গলায় দড়ি দেব।"

যতদিন জগৎ বাবুর মা বাঁচিয়াছিলেন ততদিন গৃহিণী মুখ ফুটিতে পারেন নাই, জানিতেন মুখ ফুটিলেও কিছু হইবে না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে গৃহিণী ক্রমাগত বলিতেছেন চারুর সহিত স্নেহের বিবাহ হইবে না—অন্য বর খোঁজা হউক। তবে জগৎ বাবু বর খোঁজার দিক দিয়া ঘেঁসেন না—তাঁর ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে কোন গতিকে গৃহিণীকে তাঁহার মতে আনিবেন। তাই যখন তখন আজ কাল তাঁহাদের মধ্যে এই বিষয় লইয়া তর্কাতর্কি বিবাদ চলে। জগৎ বাবু বলিলেন—"ওগো একটু ভেবে দেখ, অমন লক্ষ্মী মেয়ে কি আর কোথাও পাবে?"

গৃহিণী বলিলেন—"লক্ষ্মীমেয়ে! কেমন লক্ষ্মী সে আমি বুঝি। ঘর করতে হলে তুমিও বুঝতে। সেও যেন হোল—কিন্তু অমন বাপ-মা খেগো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে ছেলের অকল্যাণ হবে—সে আমি প্রাণ থাকতে দেব না।"

জগৎ বাবু বলিলেন—"তোমার কুসংস্কার কি কিছুতেই ভাঙ্গবে না, তোমার বিশ্বাস ভাঙ্গানর জন্যও এই বিয়ে দেওয়া উচিত।"

গৃহিণী দেখিলেন এরূপ করিয়া আর চলে না—তিনি জানিতেন কোন কথা কিরূপ করিয়া বলিলে জগৎ বাবুর আঁতে ঘা লাগে, তিনি চোখে দু ফোঁটা জল আনিয়া নাকি-সুরে বলিলেন—"দেখ স্ত্রী করেছ এই মাত্র, কখনো ত

সুখী কর্‌লে না, ছেলেকে নিয়ে যে সুখী হব তাও দেবে না?"

জগৎ বাবু চুপ করিয়া রহিলেন—এরূপ কথা বলিলেই তিনি মুস্কিলে পড়িতেন,—কেবল তাঁহার মাথা চুলকাইতে হইত।

গৃহিণী বুঝিলেন—কথার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে—তিনি আবার বলিলেন—"এ পোড়াকপালে কোন সাধই মিট্‌ল না। স্বামীর ভালবাসা যে পেলে না তার আবার সাধ করাই বা কেন? তবু মন বোঝে না, চারুর একটি ভাল বে দিয়ে সাধ আহ্লাদ করতে ইচ্ছা করে। তা তোমার যদি এও প্রাণে না সয়—ত দাও কনের সঙ্গেই বে দাও।" গৃহিণীর এইখানে থামিতে হইল—টগর দৌড়িয়া আসিয়াই বলিল—"মা, দিদি কেমন চুল বেঁধে দিয়েছে দেখ—বড় ঢল ঢল করচে—তুই আবার বেঁধে দে।" বলিয়া মায়ের কোলে বসিয়া পড়িল—বসিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"দাদার বিয়ে? কার সঙ্গে?—কনেদিদির?" এই সময় 'কনেদিদি'ও আসিয়া দাঁড়াইল।

জগৎ বাবু নিশ্বাস ছাড়িয়া যেন বাঁচিলেন, আপাততঃ গৃহিণীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। তিনি কৌচ হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া টগরকে বলিলেন—"টগ্‌রি—আজ তোদের একজামিন মনে আছে ত, বারান্দায় বই নিয়ে আয়।"

টগর বলিল, "বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে—যদু বই এনে দেয় নি।"

জগৎ বাবু বলিলেন—"তোর রোজই কি বই হারাবে! মায়ে ঝিয়ের সমান বিদ্যা হবে দেখছি—কেমন গিন্নি? আয় স্নেহ, তোর পড়া দেখিগে!" স্নেহ বই হাতে লইয়া আসিয়াছিল তাহার হাত ধরিয়া জগৎ বাবু বারান্দার দিকে অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিলেন—"দাঁড়া ঘড়িটা নিয়ে যাই, ৭টার সময় ঠিক আমার এক জায়গায় যেতে হবে।" বলিয়া জগৎ বাবু টেবিলের কাছে আসিয়া ঘড়ি না দেখিয়া বলিলেন—"ঘড়ি কোথায় গেল?"

গৃহিণী বলিলেন—"ঘড়ি? ঐ যে ঐ—কি বলে মরুক গে—ধেড়ে বেরালটা এসে ফেলে দিয়ে গেল! আহা একেবারে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে! ঐ দেখ না আলমারির মাথায় রেখেছি।" কথাটা জগৎ বাবুর অসম্ভব মনে হইল, বিশেষ তিনি গৃহিণীকে চিনিতেন, তিনি আলমারির মাথা হইতে ঘড়ির টুক্‌রাগুলি উদ্ধার করিতে করিতে টগরকে বলিলেন—"টগর ঘড়ি কে ভাঙ্গলে বল তো?"

টগর একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিল—একবার আঁ্যা আঁ্যা করিয়া বলিল—"আপনি ভেঙ্গে গেছে।" তখন তিনি স্নেহলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্নেহ, ঘড়ি কে ভেঙ্গেছে?" স্নেহলতার মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু সে সুস্পষ্ট স্বরে বলিল—"চারু"। জগৎ বাবু ঘড়ির টুক্‌রাগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া ক্রুদ্ধস্বরে গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তুমি আপনি মিথ্যা বলবে—আর ছেলেদেরও মিথ্যা শেখাবে?"

এই সময়ে দৈবের গতিকে চারুও এই ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। জগৎ বাবু রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চারু ঘড়ি কে ভাঙ্‌লে ?" চারু ভীত হইয়া উঠিল, নিজের দোষ স্বীকার করিতে সাহস হইল না, সে বলিল,—

"বাবা—বাবা—আমিত এই আস্‌ছি"—জগৎবাবুর আর সহ্য হইল না, চারুর কাণ মলিয়া বলিলেন—"চারু মিথ্যা কথা! দোষ করিয়া সত্য কহিতে তোর সাহস নাই।"

চারু ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, টগর ও স্নেহ পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল,—গৃহিণী কাঁদিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া কহিলেন "ও মাগো অত বড় ছেলেকে মার কি গো! কোথায় যাবরে আমি? কি অদৃষ্ট করেই জন্মেছিলেম।" জগৎ বাবু চারুর কাণ ছাড়িয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন,"চারু, তোকে আমি একটী ঘড়ি কিনে দিতে চেয়ে ছিলাম—আর দেব না তোর এই শাস্তি।" চারু ছাড়া পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল, টগর ও স্নেহলতা তাহার অনুবর্ত্তী হইল। গৃহিণী ও জগৎ বাবু দুই জনে ঘরের মধ্যে রহিলেন। জগৎ বাবুর যেমন স্বভাব রাগের মাথায় একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াই তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন. গৃহিণী বুঝিলেন তাঁহার কাজ আদায় করিবার এই অবসর। জগৎ বাবু যখন হঠাৎ এইরূপ কোন একটা বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিতেন, তখন তিনি মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হইতেন—তাহার পর তাঁহাকে তিনি যেমন সুবিধামত হাত করিয়া লইতে পারিতেন, এমন অন্য কোন সময়ে না—সুতরাং গৃহিণী সেই অবসরই খুঁজিতেন, সুযোগ বুঝিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"হ্যাঁ গা আমি

তোমার কাছে কি দোষ করেছি, চিরকাল তোমার জন্য প্রাণ দিলুম, তোমার সংসারের জন্য শরীরপাত করলুম, তবু কি”— গৃহিণীর আর কথা বাহির হইল না দৃশ্যটা এইখানে সহসা বড়ই করুণ হইয়া উঠিল, চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, জগৎ বাবুর মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি কেবল মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন—তাঁহার মূর্ত্তি তাঁহার রোরুদ্যমানা স্ত্রীর অপেক্ষা দ্বিগুণ শোচনীয় রূপ ধারণ করিল। এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল—“বাবুমশায়, একজন গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে, এখনি আপনার যেতে হবে।” ইহা অপেক্ষা আর সুসংবাদ এখন কি হইতে পারে—ভৃত্যকে তাঁহার পরিত্রাতা বলিয়া মনে হইল, তিনি ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই চারুর কান্না থামিল; সে গর্ব্বিত, ক্রুদ্ধ, গম্ভীর হইয়া নাট্যশালার নায়কের ভাব ধারণ করিল। লোকে মারিয়া বড় হয়, চারু মার খাইয়া আপনাকে নেপোলিয়ানের মত বীর মনে করিতে লাগিল, আর তাহার পারিষদ সঙ্গী দুইটি তাহার সেই বীরভাবে আর্দ্র, বিস্মিত এবং তাহার তুলনায় আপনাদিগকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

খানিক দূরে আসিয়া চারু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"টগর, তুই বুঝি বাবাকে বলেছিস্?"

টগর বলিল—"না, আমি না, দিদি বলেছে।"

চারু বিস্মিত-দৃষ্টিতে স্নেহের দিকে চাহিল—বুঝিল সত্যই স্নেহলতা অপরাধী—তাহার শুষ্ক মুখ, ম্লান দৃষ্টিই ইহার পূর্ণ প্রমাণ। চারু বলিল "তোকে বই দিতে গিয়ে ঘড়ি পড়ে গেল আর তুই বলে দিলি?"

স্নেহলতা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"কিন্তু মেসমশায় যে জিজ্ঞাসা করলেন!"

টগর বলিল—"তা আমাকেও ত বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তা আমি কি দাদার নাম করেছিলুম? আমি বল্লুম আপনি ভেঙ্গে গেছে।"

স্নেহ বলিল "কিন্তু সে যে মিথ্যা কথা।"

টগর। হলই বা মিথ্যা কথা!

স্নেহ। মেসমশায় যে মিথ্যা বলতে বারণ করেন।

চারু। কিন্তু এতে যে আমার মার খেতে হোল? আমি আর তোকে পড়াব না।" চারু রাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল, টগর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে বলিল—"দাদা, দাদা, মা বলেছে তোমার শীগ্‌গির বিয়ে দেবে—ক'ণে দিদির সঙ্গে।

চারু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"মা, আমি ওকে বিয়ে করব না, ও বড় দুষ্টু। মাকে বলিস্।"

বলিয়া সে চলিয়া গেল, টগরও চলিয়া গেল, স্নেহলতার চোখে জল ভরিয়া আসিল, সে আস্তে আস্তে বাড়ী ভিতরের বাগানে আসিয়া পুকুর ধারের দুই কোণে যেখানে দুইটি পাথর বাঁধান বকুল গাছ ছিল—তাহার একটির তলায় বসিল। অনেক সময় সে একাকী এইখানে বসিয়া পড়া অভ্যাস করিত, আজ সে এই নির্জ্জন গাছতলায় একাকী বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সুখ দুঃখ আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনি না, কিন্তু তাহাদের সুখ দুঃখ অধিকাংশ সময় আমাদের মতই গভীররূপে তাহারা অনুভব করে, আমরা ইহা বুঝি না বলিয়াই আমাদের নির্দ্দয় অযত্নে অনেক সময় স্ফুটনোন্মুখ হৃদয়গুলি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া বিকশিত হইয়া উঠে না। অযত্নে অনাদরেও তাহারা ফুটে সত্য, কিন্তু যত্ন করিলে যাহারা সৌন্দর্য্যে সুগন্ধে ভরপূর হইয়া জগতের আনন্দ হইয়া ফুটিতে পারিত, যত্নের অভাবে তাহারাই শুষ্ক, গন্ধহীন হইয়া নিজের এবং অন্যের

কষ্টের কারণ হইয়া ফুটে এবং তাহাদের জীবনেও ইহার স্থায়ী চিহ্ন থাকিয়া যায়।

স্নেহলতার স্নেহে অবিশ্বাস করিয়া চারু যখন রাগ করিয়া চলিয়া গেল তখন তাহার হৃদয়ে অসীম বেদনা বাজিল। "কেমন করিয়া চারু একথা মনে করে স্নেহ ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বকুনি খাওয়াইয়াছে? তাহা সে কি পারে! চারুকে সে এত ভালবাসে, সে কি চারুর মন্দ ইচ্ছা করিতে পারে! চারু এ কথা কি করিয়া মনে করিল!" ক্রমাগত স্নেহলতা ইহাই ভাবিতে লাগিল—আর ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাঝে মাঝে তাহার হৃদয় যেন একেবারে শূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল, অশ্রুজল যেন একেবারে শুকাইয়া পড়িতে লাগিল—সে তখন শূন্য-ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু ঝড় দ্বিগুণ বেগে বহিবার জন্য যেমন মাঝে মাঝে থমকিয়া বল সংগ্রহ করে, সেইরূপ দ্বিগুণ বেগে আলোড়িত হইবার জন্যই ক্রন্দনের মাঝে মাঝে হৃদয় এইরূপ প্রশান্ত হইয়া পড়ে। এই ক্ষণ-স্থায়ী সাম্য ভাবের পর স্নেহলতার মনে কষ্টের ভাব আরো তীব্রবেগে উথলিয়া উঠিতে লাগিল—তাহার মনে হইতে লাগিল—সে যদি এখনি মরিয়া যায় ত ভাল হয়, সে মরিয়া গেলে তখন আর চারুর রাগ থাকিবে না; তখন আর সে মনে করিবে না যে, ইচ্ছা করিয়া স্নেহ তাহাকে বকুনি খাওয়াইয়াছে, চারুর তখন তাহার জন্য অবশ্যই দুঃখ হইবে—তখন সে কাঁদিবে। স্নেহের বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল সে

মরে, চারুকে কাঁদাইবার জন্যই মরে। সে মরিলে যে চারু নাও কাঁদিতে পারে, কিম্বা কাঁদিলেও যে স্নেহ তাহা দেখিতে পাইবে না, এ কথা তাহার একবারো মনে আসিল না, সে কেবল নিজের মৃত্যু কল্পনা করিয়া নিজেই কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অতীতের কত স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, সে যাঁহাদের মা বলিত দিদিমা বলিত তাঁহাদের কথা মনে পড়িতে লাগিল। একটি দুঃখ আসিলে সমস্ত দুঃখই ক্রমে মনে জাগিয়া উঠে, কষ্টে দুঃখে অবসন্ন হইয়া একটি ইটের উপর মাথা রাখিয়া বালিকা সেই গাছতলাতেই শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ যেন একবার কাহার পায়ের শব্দ পাইল, চমকিয়া মুখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিল—তাহার মনে হইল "যদি চারু আসে—আসিয়া দেখে আমি কাঁদিতেছি—তাহা হইলে আর তাহার আমার উপর রাগ থাকে না।" ইহা মনে করিতেও তাহার এতটা সুখ বোধ হইল যে, তাহার চোখের জল পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেল। কিন্তু যখন দেখিল চারু আসিতেছে না তখন আবার তাহার কান্না উথলিয়া উঠিল। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে এইবার সে ঘুমাইয়া পড়িল। অস্তমান সূর্য্যের লাল আলো পুকুরের উপর পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতে লাগিল, পাখীগুলি অবিশ্রান্ত কোলাহল করিতে লাগিল, মৃদুমন্দ বায়ুর স্পর্শে বৃন্তচ্যুত হইয়া বকুলফুলগুলি স্নেহের গায়ের উপর পড়িতে লাগিল, স্নেহ তখন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—যেন বড় বৃষ্টি পড়িতেছে, সে বাগান হইতে উঠিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল, কিন্তু বাড়ীর

মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল সে বাড়ী তাহাদের বাড়ী নহে, আর কাহাদের বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়াছে। সে শঙ্কাকুল হইয়া সেই বাড়ী হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, অমনি বাড়ীর চারিদিকের দ্বার সহসা বন্ধ হইয়া গেল, স্নেহ দেখিল সে তাহার মধ্যে বন্দী, তাহার পলাইবার উপায় নাই, তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। এই সময় এক জন বালিকাকে সে গৃহের মধ্যে দেখিল, বালিকা এত কৃষ্ণবর্ণ যে তাহার যেন মাজা পাথরের শরীর, স্নেহ অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল, তাহাকে দেখিয়া তাহার ভয় চলিয়া গেল, সে মানুষ কি পাথর তাহা জানিতে স্নেহের বড়ই কৌতূহল জন্মিল, সে বালিকার নিকটে আসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইবামাত্র বালিকা হাসিয়া উঠিল। স্নেহ বুঝিল বালিকা মানুষ, এবং ইহাও বুঝিল যে সে যাদুকরী। সে উৎসুক হইয়া বলিল—"আমার হাত দেখ"। যাদুকরী হাত দেখিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "বুঝিয়াছি তুমি কে, তুমি জগৎ বাবুর বাড়ী থাক"—এই কথায় স্নেহ বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া গেল, ইহা সে কি করিয়া জানিল! তাহার মনে হইল সে আরব্য উপন্যাসের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। যাদুকরী তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিল, বুঝিয়া হাসিয়া বলিল—"বলিব চারু তোমার কে হয়?" বালিকা আরও আশ্চর্য্য হইল, সে তবে সমস্তই জানে! স্নেহ লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া বলিল—"না বলিও না।" সে বলিল, "তবে কি বলিব?"

স্নেহ বলিল—"এ কি সত্যই আরব্য উপন্যাস, ঠিক করিয়া বল?"

যাদুকরী বলিল—"আরব্য উপন্যাস নয়ত কি? আরো মজা দেখিবে?" বলিয়া সে দরজার দিকে অগ্রসর হইল এবং দরজা যেমন বন্ধ তেমনি রহিল, সে তাহার মধ্য দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। স্নেহ বিস্ময়ে অভিভূত—এমন সময় একজন ইংরাজ গোরা তাহার নিকট আসিয়া বলিল, "আমি সমস্ত দিন খাই নাই, আমাকে পয়সা দাও।" স্নেহের কাপড়ে দু একটি পয়সা বাঁধা ছিল, সে তাহা জোর করিয়া লইতে পারিত কিন্তু স্নেহ স্বেচ্ছায় তাহা দেয় কি না দেখিবার জন্যই যেন সে এ কথা বলিল, স্নেহকে পরীক্ষা করিবার জন্যই যাদুকরী তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছে। পয়সা কাপড় হইতে খুলিয়া স্নেহ তাহার হাতে দিল, তখন সে বলিল—"পয়সা লইয়া আমি কি করিব, তোমার হাতের ঐ বইখানি দাও।"

জগৎ বাবু তাহাকে সম্প্রতি তাহা কিনিয়া দিয়াছেন—সেখানি অন্য কাহাকেও দিতে স্নেহলতার কোন মতেই ইচ্ছা ছিল না, অথচ ইহাও সে বেশ বুঝিল—যে নিজে না দিলে এখনি গোরা জোর করিয়া তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লইবে। তবুও স্নেহ দিতে পারিতেছে না, এমন সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিল চারিদিক ভয়ানক অন্ধকার—তাহার মনে হইল সেই কৃষ্ণবর্ণা যাদুকরীই যেন এইরূপ অন্ধকার মূর্ত্তিতে তাহার নিকট দাঁড়াইয়া আছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে না ঢুকিতে এক জন দাসী বলিল, "তেলের জন্যে রান্না বন্ধ হয়ে আছে যে," এক জন চাকর বলিল, "বাতি নেই, কর্ত্তার ঘর অন্ধকার"।

ইহার উপর গৃহিণীর ঘন ঘন সক্রোধ চীৎকার তাহার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, আতঙ্কে কষ্ট, দুঃখ, স্বপ্ন সমস্তই সে ভুলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বয়সে—৪২।৪৩, কিন্তু ইহার মধ্যেই তাঁহার মাথার ও গোঁপদাড়ির চুল এত পাকিয়াছে যে দেখিতে তাঁহাকে ৫০ মনে হয়। জগৎ বাবুর চেহারায় বেশ একটি কমনীয় ভাব আছে; নিতান্ত রোগা নহেন, নিতান্ত মোটাও নহেন, হৃষ্ট পুষ্ট গৌরবর্ণ চেহারা, প্রফুল্ল হাসি হাসি ভাব, প্রথম পরিচয়েই লাগে ভাল, দেখিলেই মনে হয় লোকটা বেশ ভালমানুষ। তবে আজ কাল ভাল মানুষ কথাটা সব সময় বড় ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয় না, নির্ব্বোধকেও লোকে ভাল মানুষ বলে; সুতরাং এইখানে টীকা করা আবশ্যক যে, জগৎ বাবু ভাল মানুষ হইলেও নির্ব্বোধ নহেন, তিনি তাঁহার সময়ের একজন বুদ্ধিমান ছাত্র—আর এ কালের একজন প্রতিষ্ঠালব্ধ চিকিৎসক। তবে বুদ্ধিমান হইলেও তিনি সরল বুদ্ধির লোক; বিজ্ঞানের কূট তত্ত্বের মধ্যে তিনি অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারেন, কিন্তু বক্র মনুষ্যের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে তত সহজ নহে। ইহাতে যদি কেহ তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিতে চাহেন বলুন কিন্তু আমাদের মনে হয়, এরূপ

নির্ব্বুদ্ধিতাতেই যথার্থ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রট-প্লাজম্ অবস্থা হইতে উদ্ভিদ, পশু, মনুষ্য কিরূপ প্রণালীর সোপান দিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত স্বাতন্ত্র্যে আসিয়া পৌঁছায়—শরীরের কোন সূক্ষ্মতম স্নায়ু কিরূপ ভাবে কোন স্থানের কোন যন্ত্রের মধ্যে কার্য্য করে, এ সকল তাঁহার কাছে জলের মত সহজ—কিন্তু মানুষ মানুষের সহিত কি প্রকারে 'মনে এক মুখে আর' ব্যবহার করে, তাহা তিনি সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অনেক সময় সংসারে ইহার আবশ্যক বুঝেন; কিন্তু এ বিজ্ঞানে তিনি এমনি অনিপুণ যে এই আবশ্যক যখনি তিনি কার্য্যতঃ সাধন করিতে যান, তখনি প্রায় হিতে বিপরীত হইয়া উঠে।

গৃহিণী বাপের বাড়ী যাইবার নামে জগৎ বাবুকে লুকাইয়া—কালীঘাট, থিয়েটার প্রভৃতি এমন কত জায়গায় গমন করেন, জগৎ বাবু তাহার কিছুই প্রায় জানিতে পারেন না; দৈবাৎ জানিতে পারিলেও গৃহিণীর কান্নাকাটির জোরে তাঁহার ভর্ৎসনা অবশেষে সাধ্য সাধনায় পরিণত হয়। কিন্তু গৃহিণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগৎ বাবু গোপনে একটা কাজ করিয়াছেন কি—অমনি প্রায় ধরা পড়েন আর তাহার পরিণাম জগৎ বাবুর পক্ষে বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে।

দুই একটা দৃষ্টান্ত দিই—

এক দিন জগৎ বাবুর এক স্থানে রাত্রে নিমন্ত্রণ—গৃহিণী ধরিয়া পড়িলেন—থিয়েটারে লইয়া যাইতে হইবে। অনেক কষ্টে ত তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া জগৎ বাবু নিমন্ত্রণে গেলেন,

কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আহারাদির পর তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে থিয়েটারে ধরিয়া লইয়া গেল। এ কথা গৃহিনী শুনিলে আর রক্ষা থাকিবে না, জগৎ বাবু কথাটা একবারে গোপন করিবেন ভাবিলেন। রাত্রিটা তাহা গোপনেও রহিল, কেননা জগৎ বাবু যখন শুইতে আসিলেন তখন অনেক রাত, রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত করিয়া কথাবার্ত্তা কহা গৃহিণীর অভ্যাস নাই, ঘুম ভাঙ্গিবে ভয়ে কর্ত্তা আসিতেই তিনি আরো পাশ ফিরিয়া শুইলেন। প্রত্যূষে উঠিয়াই গৃহিণী গৃহ কর্ম্মে গমন করেন, সুতরাং তখনো ঠিক কথা কহিবার সময় নয়, কিন্তু কাজ কর্ম্মের শেষে আবার শয়ন-গৃহে ফিরিয়া আসিয়াও যখন জগৎ বাবুকে তিনি শয্যাগত দেখিলেন, তখন তাঁহার আর কথা কহিবার কোন বাধা না থাকায় মুখ খুলিলেন, বলিলেন—"তোমার যে দুপুরে দিন হয় দেখছি—এর বেলা বুঝি কোন অসুখ হয় না, আর আমাকে থিয়েটারে নিয়ে যেতেই যত অসুখ।"

জগৎ বাবু গেল রাত্রে অবশ্য অসুখের ওজর করেন নাই, তবে আগে কোন এক দিন করিয়া থাকিবেন।

জগৎ বাবু বলিলেন "জানত নিমন্ত্রণে গেলেই দেরী হয়।" ইতিমধ্যে টগর আসিয়া মশারি খুলিয়া তাঁহার কাছে বসিয়াছিল, সে বলিল—"বাবা, সেই গানটা গাও না, আমি ভুলে গেছি।" জগৎ বাবু তাহার ফরমাসী গানটা একটু গাহিবার পর বলিলেন—এটা থাক, একটা নতুন গান গাই শোন্—

"গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে, মৃদুল মধুর বংশী বাজে

বিসরি ত্রাস লোক লাজে, সজনি আওয়ো আওয়ো লো”

গৃহিণী বলিলেন—“এ যে অশ্রুমতীর গান?”

জগৎ বাবুর অপেক্ষা না করিয়া ইহার আগেই এক দিন গৃহিণী অশ্রুমতীর অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছিলেন। গৃহিণীর এই কথায় জগৎ বাবু তাহা ধরিতে পারিতেন—কিন্তু সে দিক দিয়া তিনি গেলেন না, তিনি কেবল নিজের উত্তরে নিজেই ধরা পড়িলেন। গান গাহিতে গাহিতে তিনি তাঁহার সঙ্কল্প ভুলিয়া গিয়াছিলেন—গৃহিণীর উত্তরে বলিলেন “হাঁ কাল বড় সুন্দর গাহিয়াছিল!”

গৃহিণী বলিলেন, “বটে! তবে তুমি কাল গিয়েছিলে?” জগৎ বাবু দেখিলেন সমস্ত ফাঁশ হইয়া গেল, তিনি মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে মহাকাণ্ড বাধিল, গৃহিণী রাগ করিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেলেন, আর তাহার পর সমস্ত সপ্তাহ মুখ ভাব করিয়া, খোঁটা দিয়া কাঁদিয়া জগৎ বাবুর এমন অবস্থা করিয়া তুলিলেন যে পরের শনিবারে একটা বিশেষ কাজ ফেলিয়াও তাঁহার গৃহিণীকে থিয়েটারে লইয়া যাইতে হইল।

আর একবার সুখীবালা নামে জগৎ বাবুর দূর সম্পর্কীয় এক দরিদ্র জ্ঞাতিকন্যা কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া জগৎ বাবুর স্ত্রীর কাছে সাহায্য প্রার্থনায় আসে। এখন বহুদিন পূর্ব্বে সুখীবালার পিতামহের সহিত জগৎ বাবুর পিতার এক মকর্দ্দমা বাধে। সুখীবালার পিতামহ অন্যায় মকর্দ্দমা আনিয়াছিলেন এই বিশ্বাসে মকর্দ্দমায় জগৎ বাবুর পিতা জয়লাভ করিলেও তিনি পরে আর উহাদের সহিত আত্মীয়তা

রাখেন নাই। যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন সুখীবালার জন্মও হয় নাই, গৃহিণীর বিবাহও হয় নাই, পরে গৃহিণী তাঁহার শাশুড়ির কাছে ইহা শুনিয়াছিলেন। আপাততঃ সুখীবালা গৃহিণীর কাছে দুঃখ জানাইতেই তাহার পিতামহের সেই শত্রুতার কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, সুতরাং দানের মধ্যে কতকগুলা কড়া কড়া কথামাত্র দান করিয়া সুখীবালাকে তিনি বিদায় দিলেন।

সুখীবালা ত কাঁদিয়া চলিয়া গেল, তিনি মনে করিলেন তিনি একটা মস্ত প্রশংসার কাজ করিয়াছেন, জগৎ বাবু আসিতেই মহা গর্ব্বভরে তাঁহার নিকট এই গল্প করিলেন। জগৎ বাবু অবশ্য তাঁহার ব্যবহারে মনে মনে মহা ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং সুখীবালাকে গোপনে ৫০০৲ শত টাকা প্রেরণ করিয়া এই ব্যবহারের প্রতিকার করিলেন।

এখন তাঁহার পকেটের যে নোট-বুকে তিনি এইরূপ লুকান খরচ পত্র টুকিয়া রাখিতেন, সেইখানি কিরূপে একদিন তাঁহার পকেট হইতে বিছানায় পড়িয়া গিয়াছিল। চারু গৃহে আসিয়া বইখানি লইয়া পড়িতেছিল। পড়িতে পড়িতে একবার পড়িল—"সুখী ফাইভ্ হানড্রেড্, সুখীবালার নামটা কানে যাইতেই গৃহিণীর মন খারাপ হইয়া গেল—বলিলেন—"কি"? চারু আবার বলিল, "সুখী—ফাইভ হানড্রেড্?" গৃহিণী বলিলেন—"ওটার মানে কি?"

চারু। পাঁচশ।

গৃহিণীর আর কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না। যে দিন তিনি জগৎ বাবুর নিকট সুখীর গল্প করেন, সে দিন জগৎ

বাবু সিন্ধুক খুলিয়া পাঁচ শত টাকা লইয়াছিলেন তাহাও মনে পড়িল। কর্ত্তা আসিতেই বলিলেন—"সুখীকে পাঁচ শ টাকা দেওয়া হয়েছে?"

কর্ত্তা বলিলেন—"কে বল্লে?"

গৃহিণী। কে বল্লে! যেন ওসব কথা জানতে বাকী থাকে! কেবল আমার বেলাতেই হাত দিয়ে এক পয়সা বার হয় না, তা হবে কেন! আমি যে পর, কিন্তু আমি ত আর শত্রু নই!

কিছু দিন পূর্ব্বে গৃহিণী তাঁহার বোনঝির বিবাহের যৌতুকের গহনা গড়াইবার জন্য কর্ত্তার নিকট দুই শত টাকা চাহেন, তাহাতে জগৎ বাবু একশ টাকা দিয়া বলিয়াছিলেন "সম্প্রতি চাকর পৈতাতে ও একটা মকর্দ্দমায় অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে—এখন আর অত বেশী টাকার যৌতুক দিয়ে কাজ নেই।" গৃহিণী আপাততঃ সেই খোঁটা দিতে আরম্ভ করিলেন।

জগৎ বাবু বিব্রত হইয়া সেই যৌতুক এবং এই দানের মধ্যে যে কি প্রভেদ তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গৃহিণী তাহা যত বুঝিবার পাত্র তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন। জগৎ বাবুর পক্ষপাতিতায় তিনি ভগ্ন হৃদয় হইয়া পড়িলেন, এবং ২০০৲ শতের স্থলে ৫০০৲ শত টাকা বোনঝির যৌতুক স্বরূপ আদায় করিয়াও জগৎ বাবুকে তাঁহার অপবাদ হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন না।

এই সকল ঘটনা হইতে পাঠক বুঝিয়াছেন—জগৎ বাবু যেরূপ সরল-প্রকৃতি, সেরূপ সবল-প্রকৃতি নহেন; এবং

আসলে তাহা নহেন বলিয়া তাঁহার যত সহ্য করিতে হয়—সরল বলিয়া তত নহে।

জগৎ বাবু হেঙ্গামকে বড় ভয় করেন, কিন্তু এরূপ দুর্ব্বল স্বভাবদিগের যেরূপ হইয়া থাকে—হেঙ্গাম এড়াইতে গিয়াই তিনি আরো অধিক হেঙ্গামে পড়েন, গৃহিণীর কান্না কাটায় তিনি যত নরম হন—গৃহিণীর জুলুমও তত বাড়িয়া উঠে। তিনি একটু জবরদস্ত লোক হইলে আর এরূপ ঘটিত না। যাহা হউক এই কারণে স্ত্রী-সমাজে জগৎ বাবু আদর্শ স্বামী, কিন্তু পুরুষ মহলে স্ত্রৈণ বলিয়া রাষ্ট্র। ইহাতেও সুবিধার ভাগ জগৎ বাবুর স্ত্রীর—আর অসুবিধার ভাগ জগৎ বাবুর। জগৎ বাবুর স্ত্রীর এ জন্য মেয়ে মহলে মহা আদর বিবাহ নিমন্ত্রণে তিনি সকল স্থলেই প্রধান সম্মান লাভ করেন—হাই আমলা বাঁটা, বরণডালা সাজান—প্রভৃতি স্বামী বশীকরণ-তুক তাঁহার হাত দিয়া সম্পন্ন না হইলে কন্যার মাতাগণ কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না। আর জগৎ বাবু বেচারা এই জন্য বন্ধু মহলে Chicken-hearted baby, কাপুরুষ, স্ত্রৈণ, এই সকল নামে সম্ভাষিত হন। তবে এ সকল ঠাট্টা বিদ্রূপও জগৎ বাবুর সহ্য হয় কিন্তু তাঁহার অমঙ্গল ভয়ে আকুল হইয়া মাঝে মাঝে গম্ভীর ভাবে যখন তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার ব্যবহার সংযত করিতে পরামর্শ প্রদান করেন তখনই তিনি বিব্রত হইয়া পড়েন। ইহার প্রধান কারণ, তিনি তাঁহার নিজের দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণ বোঝেন। তিনি বেশ জানেন—তিনি যদি গৃহিণীর কান্নাকাটা না মানিয়া নিজের সংকল্পে দৃঢ় থাকিতে পারেন তাহা হইলে ক্রমে তাঁহার কান্নাকাটিও

কমিয়া আসে। এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি যে চেষ্টা করেন না—এমনও নহে। গৃহিণীর সহিত কোন বিবাদ বাধিলে সাধারণতঃ বিবাদের প্রথম ভাগে তিনি প্রায়ই বেশ অটল থাকেন—কিন্তু এমনি তাঁহার দুর্ভাগ্য—পরে এই অস্বাভাবিক অটলতাই সময় সময় আবার বিশেষরূপে তাঁহার পরাজয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

জগৎ বাবুর প্রথম সন্তান অতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। গৃহিণীর ইচ্ছা তাহাকে ঔষধের সাহায্যে হৃষ্টপুষ্ট করিয়া তোলেন, জগৎ বাবু বুঝিতেন তাহাতে মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই ঘটিবে। তিনি কোন ঔষধ দিতে চাহিতেন না। গৃহিণী নিরাশ হইয়া অবশেষে লুকাইয়া টোটকা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ক্রমে তাহার শরীর এমন ভগ্ন হইয়া পড়িল যে, তখন জগৎ বাবুও আর ঔষধ ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিলেন না, কিন্তু অজস্র ঔষধেও তখন আর কোন ফল হইল না, অকাল মৃত্যুর কোলে সে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গৃহিণীর মনে হইল—জগৎ বাবুর দোষেই তিনি পুত্রহীনা হইলেন—যথেষ্ট ঔষধাভাবে সে মারা গেল, জগৎ বাবুও বুঝিলেন—তিনিই দোষী। মর্ম্মাহত হইয়া নিজের দুর্ব্বলতাকে তিনি অভিসম্পাৎ করিতে লাগিলেন।

ইহা ছাড়া তাঁহার অন্য উপায় কি? তাঁহার কষ্টের কারণকে তিনি গালিই দিতে পারেন, দূর করিতে ত তাঁহার ক্ষমতা নাই। এইরূপ স্বভাব লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই স্বভাবেই তাঁহার নিজত্ব, এ নিজত্ব ভঙ্গ করা বিধাতার হাত, তাঁহার নহে।

লোকে কিন্তু এ কথা ঠিক বুঝিতে পারে না, তাহারা ভাবে—যাহা হওয়া উচিত, স্বভাব অতিক্রম করিয়াই বা তাহা না হইবে কেন, যখন তাহাই প্রার্থনীয়। কিন্তু সংসারে তাহা হয় না। জগৎ বাবুও তাহা প্রার্থনা করিতেন কিন্তু দেখিতেন তাহা হইতেছে না। কেবল গৃহিণীর সহিত ব্যবহারে নহে, বাল্যকাল হইতে যেখানেই তাঁহার সংকল্পের সহিত দুর্ব্বলতার যুদ্ধ বাধিয়াছে—সেইখানেই প্রায় তাঁহার দুর্ব্বলতারই জয় হইয়াছে।

আমরা অপর পরিচ্ছেদে তাঁহার বাল্য জীবন সংক্ষেপে বিবৃত করিব।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জগৎ বাবুর মাতার দেবধর্ম্মে আত্যন্তিক নিষ্ঠা ছিল, পূজা অর্চ্চনা লইয়াই তিনি প্রায় থাকিতেন; তাঁহার এই ধর্ম্মের ভাব জগৎ বাবুর মনেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। তবে ঘটনা ও অবস্থার প্রভেদে সকল সময়ে ঠিক সমান ভাবে ইহার প্রভাব তাঁহার মনে রক্ষিত হয় নাই। বাল্যকালে জগৎ বাবু শালগ্রাম শিলার প্রতি বিশেষ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যার সময়ে মাতার সহিত ঠাকুর-গৃহে গমন করিতেন, এবং পূজা শেষে মা যে প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইতেন, জগৎ বাবুও ঠিক সেই-রূপ প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিতেন। জগৎ বাবু সাত বৎসর বয়সে স্কুলে ভর্ত্তি হন, ইহার পর এক বৎসর না যাইতে যাইতে তাঁহার প্রার্থনা পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইল। মাতার প্রার্থনার আর তিনি তখন অনুকরণ করেন না—প্রণাম করিবার সময় তিনি তখন মনে মনে বলেন, "হরি—আজ যেন আমি ফার্ষ্ট হই—মাষ্টার মহাশয় যেন আজ আমাকে না দাঁড় করাইয়া দেন, মন্মথ যেন আজ আমার সঙ্গে ভাব করে—ইত্যাদি। ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার এইরূপ প্রার্থনা চলিল, তাহার পর অন্যরূপ হইল।

একদিন বালক জগৎকে খেলার সময় কাঁদিতে দেখিয়া উপর ক্লাসের একজন বালক তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"জগৎ, কি হয়েছে?"

বালক বলিল—"দেবী আমার পেন্সিল কেড়ে নিয়ে আমাকে মেরেছে—"

বামাচরণ দেবীকে ধমকাইতেই সে তাহা একেবারে অস্বীকার করিল, এবং সরিয়া গিয়া পশ্চাৎ হইতে দুই জনকেই ভ্যাংচাইয়া চলিয়া গেল। জগৎ রাগিয়া বলিল—"আমি বলে দেব।"

বামাচরণ বলিল—"কাকে—মাষ্টারকে? কিন্তু তুমি প্রমাণ দিতে পার্‌বে না ত?"

সে বলিল, "না, ঠাকুরকে?"

বামাচরণ। কোন্ ঠাকুরকে?

জগ। আমাদের শালগ্রাম ঠাকুরকে। তিনি জব্দ করবেন।

বামাচরণ হাসিয়া বলিল, "শালগ্রাম ত পাথর, তোমার কথা কি তার কাণে যায়—? তা হলে ঐ থামটাকেও ত বলতে পার?"

বালকের প্রাণটা হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, কথাটায় তাহার মনে বড়ই আঘাত লাগিল। সে বাড়ী গিয়া আরতির সময় শালগ্রামের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—তাহার মনে হইল, সত্যইত ইহা পাথর! সে দিন আর তেমন ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সে প্রণাম করিতে পারিল না। পরদিন মাকে বলিল—"মা, শালগ্রাম ত পাথর—তবে আমাদের কথা কি করে শোনেন?"

মা বলিলেন—"ছি, বাছা ও কথা কি বলে? উনিই হরি। ঐ পাথরের মধ্যেই হরির অধিষ্ঠান—"

বালক বলিল—"সকল পাথরেই হরি আছেন?"

মা। তিনি সকল জায়গাতেই আছেন—কিন্তু আমরা ত তা বুঝতে পারিনে, তাই আমাদের পূজা নেবার জন্য এই শালগ্রাম শিলায় তিনি আবির্ভাব হয়েছেন।

এই কথার মধ্যে যে তত্ত্ব আছে তাহা বালক অবশ্য বুঝিল না, কিন্তু তাহার মা ভাবিলেন সে এবার বেশ বুঝিয়াছে। বালক নিজেও তাহাই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হৃদয়ে চলিয়া গেল। কিন্তু পরদিন আবার তাহার সন্দেহ হইল, সে স্কুলে গিয়া বামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিল—"যদি পাথর হরি নন্ ত হরি কে?"

ব্রাহ্ম বামাচরণ বলিল, "ঈশ্বরই হরি।" ইহাতে যে বালক বিশেষ জ্ঞানলাভ করিল তাহা নহে, সে আবার বলিল—"ঈশ্বর কিরূপ?"

বামাচরণ বলিল—"ঈশ্বর নিরাকার, জ্ঞানস্বরূপ, মঙ্গলময়, তিনি এই জগৎ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা এ চক্ষু দিয়া দেখিতে পাই না, কিন্তু জ্ঞান চক্ষু দিয়া দেখিতে পাই, তাঁহার নামে তাঁহার সৃষ্ট বস্তুর পূজা করিলে তাঁহার অবমাননা করা হয়, একমাত্র তাঁহার আরাধনাই ঐহিক পারমার্থিক মঙ্গলের কারণ।" বামাচরণ সমাজে যেরূপ বক্তৃতা শুনিত যতদূর পারে তাহা মনে করিয়া বলিল। কিন্তু এ সকল কথা জগতের হৃদয়ঙ্গম হইল না, বরঞ্চ শালগ্রামকে হরি বলিয়া বুঝা ইহাপেক্ষা তাহার পক্ষে সহজ ছিল। কিন্তু ইহার পর তাহাও সে পারিল না, কেবল এইমাত্র জানিয়া রাখিল ঈশ্বর নিরাকার তাঁহাকে দেখা

যায় না। ক্রমে বালক যত বড় হইতে লাগিল বামাচরণের সহিত তাহার ভাব তত বাড়িতে লাগিল, এবং এই সূত্রে আরো অনেক ব্রাহ্ম বালকদিগের সহিত তাহার পরিচয় হইল। তাহাদের সহিত নিয়মিত জগৎ বাবু ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে লাগিলেন, আগে যাহা তাঁহার দুর্ব্বোধ্য হইয়াছিল, ক্রমে তিনি তাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। ষোল বৎসর বয়সে জগৎ বাবু এণ্ট্রেন্স পাস করেন। তখন নূতন উৎসাহে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ, তিনি তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে মানস করিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প গোপন রহিল না, পিতা মাতার কর্ণে তাহা উঠিল। মা তাহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—বলিলেন— "বাবা, তোকে মানুষ করেছি কি পর করবার জন্যে! আমাদের ছেড়ে তুই কোথায় যাবি, বাবা!"

পিতা রাগ করিয়া বলিলেন—"তুই যদি ব্রাহ্ম হবি ত তোকে আমি ত্যজ্য পুত্র করব।" তিনি তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া যত দিন না বিবাহ হইল ততদিন একেবারে বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, তাহার পর বিবাহ দিয়া যখন তাহার মনে হইল তাহাকে নিগড় পরাইয়াছেন, তখন মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

জগৎ বাবু আর প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল না। সেই প্রথম যৌবনে তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব প্রবল, উৎসাহের ভাব প্রবল, ভালবাসার ভাব প্রবল, সেই সঙ্গে সামাজিক অবনতির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে, বিবাহের পর

জীবনের এই সমস্ত আবেগ সমস্ত আশা একটি মাত্র প্রণালীতে প্রবাহিত হইল, তাঁহার নব বিবাহিত স্ত্রীকে নিজের মনের মত করিয়া গঠন করিতে তিনি তাঁহার সমস্ত উৎসাহ অর্পণ করিলেন। যখন তাঁহার বিবাহ হয়, তখন স্ত্রীর বয়স দশ কিন্তু ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই সে একরূপ লেখা পড়া শিখিল, ধর্ম্মের ভাবেও তাহার হৃদয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, জগৎ বাবু তাহাতে পরম সুখী হইলেন, সংসারে থাকিয়া তিনি আপনাকে ত্রিলোকস্বামী বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

পিতা যখন তাঁহাকে ব্রাহ্ম হইতে দেন নাই, তখন তাঁহার কষ্টের সীমা ছিল না, আপনার দুর্ব্বলতায় তিনি যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বাসের বিপরীত কাজ করিতে বাধ্য হইয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল তিনি আত্মহত্যা করিলেন। কিন্তু বিবাহের পর ক্রমে সান্ত্বনা লাভ করিলেন। তাঁহার মনে হইল—"আমার মত দুর্ব্বল লোকের ধর্ম্ম-প্রকাশে কি লাভ? আমি কি কখনো সুদৃঢ় বিশ্বাস-বলে মনুষ্যের উচ্চতম কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইতাম? রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন যাঁহারা মহাত্মা লোক—শত বাধা অতিক্রম করিয়া জীবন দিয়া সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহারাই সক্ষম, তাঁহাদের বিশ্বাসেই জগৎ জাগরিত হইবে, তাঁহাদের দৃষ্টান্তই জগৎ অনুকরণ করিবে। আমি কে? একটা অঙ্গুলির তর্জ্জনে দাঁড়াইতে যে অক্ষম তাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রকাশে কিম্বা অপ্রকাশে জগতের কি ক্ষতি বৃদ্ধি! কিন্তু?—"

এইখানে আবার তাঁহার মন "কিন্তু"তে পূর্ণ হইয়া উঠে।

"জগতের ক্ষতি বৃদ্ধি—? জগৎ কি? ক্ষুদ্র মনুষ্যের সমষ্টিতেই জগৎ, যদি একজন মনুষ্যও তাহার কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হয় তাহাতেই জগতের ক্ষতি, আমার নিজের বৃদ্ধিতে জগতেরো বৃদ্ধি। মনে মনে আমি পুতুল পূজা করিতেছি না সত্য, মনে মনে আমি সত্যধর্ম্মের বিশ্বাসী সত্য, কিন্তু বাহ্যানুষ্ঠানে বাহ্য ব্যবহারে ইহার বিপরীত কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া কি আমি নিজের ধর্ম্ম-হানি করিতেছি না?"

জগৎ বাবু এ প্রশ্নে আপনার নিকট আপনি নিরুত্তর হইয়া পড়েন, তথন নিজের প্রতি তাঁহার নিজের অনুকম্পা উপস্থিত হয়, সেই করুণা-বলে ঈশ্বরের করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সে অপরাধের মার্জ্জনা অনুভব করেন। তিনি মনে করেন—"কর্ত্তব্য কি সকলের পক্ষে সমান? অবস্থানুসারে লোকের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম-বিশ্বাস সর্ব্বতোভাবে অথণ্ড রাথিয়া জগতের জন্য কার্য্য করা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কর্ত্তব্য, কেননা তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য সাধিত হয়, কিন্তু সকলের মহৎ কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। সংসারে গৃহ-কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি অনেক আছে, কিন্তু বুদ্ধ যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি কয় জন মহৎলোক জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ক্ষুদ্র লোকের মহৎ কার্য্য সাধিত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমি যদি পিতা মাতা ত্যাগ করিয়া সমাজ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতাম, তাহা

হইলে না আমি ঈশ্বরধর্ম্ম রাখিতে পরিতাম, না মানব ধর্ম্ম রাখিতে পারিতাম! ঈশ্বর আমাকে ক্ষুদ্র লোক করিয়া জন্ম দিয়াছেন, আমি সংসারের ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য পালন করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য সাধন করিব, আমি পিতা মাতার আজ্ঞা পালন করিয়া, স্ত্রীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব, —কেননা ইহা পালনই আমার পক্ষে সহজ, অন্য কর্ত্তব্য আমার পক্ষে অসাধনীয়। এই কর্ত্তব্য পালন করিতে অন্য কর্ত্তব্যের যদি হানি হয়, তাহা তিনি মার্জ্জনা করিবেন— কেননা তিনি আমাকে ক্ষুদ্র করিয়া জন্ম দিয়াছেন।

জগৎ বাবু এইরূপ ভাবিয়া প্রশান্ত হৃদয়ে গৃহধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহার এ সুখ শান্তি স্থায়ী হইল না। জগৎ বাবু যে বৎসরে চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, যৌবনের আনন্দ উচ্ছ্বাস লইয়া, যে বৎসরে বিংশতি অতিক্রম করিয়া এক বিংশতিতে পদার্পণ করিলেন, সেই বৎসরে তাঁহার প্রাণ হইতে প্রিয়তমা পঞ্চদশ বর্ষীয়া পত্নী এক মৃত সন্তান প্রসব করিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিল। এই নিদারুণ আঘাতে জগৎ বাবুর সমস্ত আশা, আনন্দ, অভিলাষ, উদ্যম এমন কি ধর্ম্ম বিশ্বাস পর্য্যন্ত শিথিলমূল হইয়া পড়িল। দিন কতক তিনি বিশ্বাসহীন অস্থির জীবন লইয়া উন্মত্তের মত উদ্দেশ্যশূন্য জীবন বহন করিয়া বেড়াইলেন। এতদিন প্রাণী-বিজ্ঞানের অনাত্মবাদ তিনি মিথ্যা বলিয়া অনুভব করিতেন, স্নায়বীয় শক্তির যন্ত্রবৎ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াও ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের

প্রমাণ যুক্তি অগ্রাহ্য করিতেন—কিন্তু এখন সেই জড় বিজ্ঞানের পরপারে তিনি আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, সহসা যেন তাঁহার নয়ন অন্ধ হইয়া গেল। যাহার বর্ত্তমানে সংসার মঙ্গলময় আত্মাময় বলিয়া বোধ হইত—তাহার অবর্ত্তমানে সংসার অর্থহীন যন্ত্র-বিশেষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল, ইহার মধ্যে জ্ঞানময় আত্মার প্রভাব আর তিনি দেখিতে পাইলেন না, অমঙ্গল, অজ্ঞান, জড়তা, মৃত্যু-মাত্র এই জগতের সর্ব্বস্ব বলিয়া তিনি অনুভব করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার জীবনে আর একটি ঘটনা ঘটিল। তাঁহার স্ত্রীর স্বসম্পর্কীয় এক বিধবার চিকিৎসা ভার তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়িল। বিধবার মাতা ভিন্ন আর কেহ ছিল না, সে স্বামীর অন্ন যাহা টাকা কড়ি পাইয়াছিল, তাহা লইয়া মাতৃগৃহে বাস করিত, সেইখানে চিকিৎসা-উপলক্ষে জগৎ বাবুর সহিত তাহার আলাপ হইল। ক্রমে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল, রোগীকে দেখিতে আসিয়া জগৎ বাবু সেইখানেই দিন কাটাইতে আরম্ভ করিলেন, রোগী যখন আরোগ্য হইল, তখনও তিনি তাহাকে দেখিতে আসা বন্ধ করিলেন না। বাহিরে গোলযোগ আরম্ভ হইল, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার ব্যবহার অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল, তিনি তর্ক করিতে উদ্যত হইলেন, "কিছুমাত্র অনুচিত নহে, কেননা তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন।"

তিনি মনে করিলেন ইহার উপর আর কাহারো কিছু বলিবার নাই। কিন্তু হিতে বিপরীত দাঁড়াইল। সকলেই

ইহাতে ক্রুদ্ধ বিরক্ত, আশ্চর্য্য হইয়া একবাক্যে তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি ও মূর্খতার নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বিধবার সম্বন্ধে এত কথা বলিল, যে তাহার কোনটিই বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া বিশ্বাস সত্বেও তিনি মনে মনে দমিয়া গেলেন। তখন তাহাদের সহিত ঘোর তর্ক করিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল—তিনি ভাল কাজ করিতেছেন কি না।

আসল কথা জগৎ বাবু যে সেই বিধবাকে প্রগাঢ় প্রেম হইতেই বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন তাহা নহে; করুণা জাতীয় প্রেম এবং সামাজিক বিধির বিপক্ষে কার্য্য করিবার ইচ্ছা হইতেই তাহার এই বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়। সুতরাং বিধবার নিকট বিবাহে প্রতিশ্রুত হইলেও বন্ধুদের কথায় তাহা তাঁহার এখন বিবেচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অধিক দিন এ সম্বন্ধে তাঁহাকে অস্থিরচিত্ত থাকিতে হইল না, অল্প দিনের মধ্যেই এ কথা পিতার কর্ণে উঠিল, এবং ইহা শুনিবামাত্র তিনি অবিলম্বে এক কন্যা স্থির করিয়া তিন চারি দিনের মধ্যেই তাঁহার বিবাহ দিয়া দিলেন। বিবাহের পর জগৎ বাবুর এত লজ্জা বোধ হইল যে, কিছু দিন তিনি বিধবার বাড়ী একেবারেই যাইতে পারিলেন না; তাহাদের খবর বার্ত্তাও আর কিছু পাইলেন না। ৫।৬ মাস পরে একদিন সেই বাড়ীর নিকট দিয়া গাড়ি করিয়া যাইবার সময় দেখিলেন গৃহের দ্বার রুদ্ধ, বুঝিলেন সেখানে কেহ নাই। পরে সন্ধান করায় কেহ বলিল—বিধবা আত্মহত্যা করিয়াছে, আর তাহার মা কাশী গিয়াছে—কেহ বলিল দুজনেই কাশী

গিয়াছে। জগৎ বাবুর প্রাণে আবার এক ভয়ঙ্কর আঘাত লাগিল। তিনি কি ভয়ানক কাজ করিয়াছেন তাহা বুঝিলেন, অনুতাপে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি জীবনে অন্য যত অন্যায় করিয়াছেন, ইহার পক্ষে তাহা লঘু। সে সকল তাঁহার একমাত্র সাহসের অভাব হইতে প্রসূত—ইহাতে তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের অভাবও জড়িত! তিনি সেই বিধবার পথে না আসিলে তাহার এই শোচনীয় পরিণাম হইত না! যদিই বা আসিলেন কেন বিবাহ করিলেন না! তাহাকে আশা দিয়া প্রতারণা করিয়া শেষে তাহার এই মৃত্যুর কারণ হইলেন! তাঁহার পরিণীতা পত্নী হইলে আজীবন ধর্ম্মপথে থাকিয়া সে কি সুখে জীবন কাটাইতে পারিত না? তাঁহারি সাহসের অভাবে, ধর্ম্মভাবের অভাবে এইরূপ হইয়াছে! ধর্ম্মের অভাব কি যে ভয়ানক, তাহা হইতে মানুষ কিরূপ জঘন্য কাজও করিতে পারে তাহা তিনি বুঝিলেন। এই ঘটনা হইতে আবার তাঁহার ধর্ম্মের বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল, এক আঘাতে তাহা দূর হইয়াছিল—অন্য আঘাতে তাহা ফিরিয়া পাইলেন।

তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পীড়িত অনুতপ্ত হৃদয় কিছু দিন আর সংসারের দিকে চাহিতে সক্ষম হয় নাই, বৎসরাবধি স্ত্রী কেমন তাহা তিনি চোখে দেখেন নাই, কিন্তু ক্রমে আবার তিনি আত্মস্থ হইলেন, বুঝিলেন বিবাহ করিয়া তাহাকে অবহেলা করা তাঁহার অন্যায়. কর্ত্তব্যের প্রতি আবার তাঁহার দৃষ্টি পড়িল—যাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে সুখী করিতে যত্নবান হইলেন। গৃহিণীর

দ্বাদশ বর্ষে বিবাহ হইয়াছিল—ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি স্বামী কর্ত্তৃক গৃহীতা হইলেন। এক বৎসর প্রায় তিনি পিত্রালয়েই ছিলেন। জগৎ বাবু তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রীর ন্যায় ইঁহাকেও জ্ঞান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি এখনো জগৎ বাবুর মনে আদর্শস্বরূপ জাগ্রত ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই আর এ স্ত্রীকে তিনি সে আদর্শে গড়িয়া তুলিতে পারিলেন না। জগৎ বাবুর নিজেরও আগেকার মত আর উদ্যম নাই. কর্ত্তব্য ভাবিয়া তিনি তাহাকে শিক্ষা দিতে আসেন, মাত্র, ইহার উপর তাঁহার অবসরও অল্প, কাজ কর্ম্ম সারিয়া রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে তিনি তাহাকে শিখাইতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু গৃহিণীরও এত পড়ায় মন নাই—যে পড়ার আগ্রহে নিদ্রার হস্ত হইতে তিনি অব্যাহতি পান। সুতরাং দাঁড়ায় এই, স্বামী বকিয়া যান, গৃহিণী ঢোলেন। ইহা দেখিয়া জগৎ বাবু দিনের বেলা একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিলেন, স্থির রহিল গৃহিণী ও জগৎ বাবুর ভগিনী সুমতি উভয়ে সেই সময় তাঁহার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিবেন। দিন কতক নিয়ম মত শিখান চলিল, তাহাতে লাভ হইল সুমতির, কিন্তু গৃহিণীর বিশেষ কিছুই হইল না, দিনকের দিন তিনি অমনোযোগী অবাধ্য হইতে লাগিলেন. জগৎ বাবু কিছু বলিলেই কান্না-কাটি আরম্ভ করিতেন। এই অবস্থায় তিনি অন্তঃস্বত্বা হইলেন, পড়া শুনা বন্ধ হইল, তিনি পিতৃগৃহে গমন করিলেন। যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহাকে আর কে পায়—তখন ছেলে পিলে দেখিবেন, না স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য তাঁহার কাছে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিবেন বা পড়া আওড়াই-

খেন। জগৎ বাবু দেখিয়া শুনিয়া নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন। স্ত্রীকে মনের মত করিতে পারিলেন না—সন্তানদিগকে মনের মত করিয়া তুলিবার বাসনা তাঁহার হৃদয় মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিল।

কিন্তু পরে দেখিলেন তাহাতেও পূর্ণ বাধা, স্বামী স্ত্রী এক-মত না হইলে সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তিনি যেখানে সত্য বলিতে শেখান, স্ত্রী সেখানে মিথ্যা বলিতে শেখান। তিনি যদি মেয়েকে লেখাপড়া করিবার কথা বলেন ত গৃহিণী নানা উপহাস বিদ্রূপে তাঁহাকে নিরুৎসাহ করেন। তিনি যদি তাহাতে কোন কথা কহেন তবে ক্রমে ঝগড়া বাধে, সমস্ত দিন গৃহিণী মুখ ভার করিয়া থাকেন, না হয় ছেলেদের লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যান, মাস খানেক আর আসেন না—তাহার মধ্যে তাঁহার শিক্ষার চতুর্গুণ বিপরীত তাহারা শিখিয়া আসে। এইরূপ কারণে ক্রমে তাঁহার ইহাতেও যত্ন শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, ছেলে-দের জন্য মাষ্টার পণ্ডিত রাখিয়া দিলেন এই মাত্র। যাহা হউক তখন সংসার নির্বিবাদে চলিতে লাগিল। এই অবস্থায় সুমতি পীড়িত হইয়া শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আগমন করিল। সুমতির তখন বয়স ১৮ কিন্তু তখনো তাহার সন্তান হয় নাই। তাহার একমাত্র ননদকে শ্বশুর কুলীন করিয়া ঘরে রাখেন—তাহার একটি কন্যা হইবার পর সে বিধবা হয় এবং কন্যাটি যখন কয়েক মাসের মাত্র তখন নিজেও এ সংসার ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুসরণ করে। সুমতি এই পিতৃমাতৃহীন শিশুকে আপনার সন্তানের

মত পালন করিয়াছিল, পিত্রালয় আসিবার সময় সে ইহাকে সঙ্গে লইয়া আসে—এই কন্যাই স্নেহলতা। পিত্রালয়ে আসিয়া সুমতির মৃত্যু হইল, মরিবার সময় মা ও দাদাকে কন্যাটি সে সমর্পণ করিয়া গেল। স্নেহলতা তখন আট বৎসরের। জগৎ বাবু দেখিলেন তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে যে সকল গুণযুক্ত দেখিতে চান, এই বালিকার সেই সকল গুণ আছে। বালিকা, নম্র অথচ সরল; বালিকা অলস নহে, বালিকা বিদ্যানুরাগী, সে সত্য কথা বলে, স্বাভাবিক কোমলভাবে তাহার হৃদয় পূর্ণ। জগৎ বাবু দিন দিন তাহাকে নিজের ছেলেদের মতই ভালবাসিতে লাগিলেন, জগৎ বাবুর মা'ও তাহার গুণে বশীভূত হইলেন। জগৎ বাবুর স্ত্রী'ও প্রথম প্রথম তাহাকে যত্ন করিতেন, তাহাকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু যখন দেখিলেন জগৎ বাবু তাহাকে বড় বেশীরকম ভাল বাসিতেছেন, সারাদিন তাহার গুণের কথা তাঁহার মুখে লাগিয়া আছে—টগর তাহার মত নহে বলিয়া যখন তখন জগৎ বাবু দুঃখ প্রকাশ করেন—তখন তাঁহার মনে ক্রমে স্নেহলতার প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল, ক্রমে স্নেহলতা তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একটা অসুখের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সে দিন রাত্রে যখন জগৎ বাবু বাড়ী ফিরিলেন, তখন ৮টা। তাঁহার বাহিরের বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিলেন তখনো ঘর অন্ধকার; আশ্চর্য্য হইলেন। চাকরদের ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, তেল পায় নাই তাই বাতি তৈয়ার করিতে পারে নাই। তিনি বুঝিলেন আবার একটা নুতন গোলযোগ ঘটিয়াছে; বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখিলেন, তাঁহার শয়নগৃহেও আলো নাই,—গৃহিণী বারান্দায় দাঁড়াইয়া গলা জাহির করিতেছেন। আসল কথা গৃহিণীর ইচ্ছা থাকিলে যে গৃহে আলো জ্বলিত না তাহা নহে, ভাঁড়ার ঘরের কাজ শেষ হইলে স্নেহলতা চাবি তাঁহার কাছেই রাখিয়া যাইত। কিন্তু আপাততঃ তাঁহার মতলব—স্নেহলতা কেমন গুণের মেয়ে এই অবসরে চোখে আঙুল দিয়া বাবুকে তাহা দেখাইয়া দেন। ঘর অন্ধকার না রাখিলে সে অভিপ্রায় ত আর সিদ্ধ হয় না,—এমন সুযোগ কিছু যখন তখন মিলিবার নয়, কাজেই চাকরেরা এখনো বাতি জ্বালিতে তেল পায় নাই। কর্ত্তা গৃহে আসিয়া বলিলেন—"ব্যাপার খানা কি? ঘর সব অন্ধকার কেন?"

গৃহিণী বলিলেন—"তোমার কর্ম্মিষ্টি সুবোধ, শিষ্টশান্ত মেয়েটির কর্ম্ম। সে যে কোথায় থাকে তার ঠিক নেই, কেউ তো খুঁজে পাচ্ছে না। টগর যদি এমন কর্ত্তো ত আমি

রক্ষা রাখতুম না—কিন্তু ওকে ত আর কিছু বলবার যো নেই।”

জগৎ বাবু বলিলেন—“নিশ্চয় তার কোন অসুখ করেছে, বুঝি বিছানায় শুয়ে টুয়ে আছে—দেখ দেখি।”

জগৎ বাবু তাহাকে খুঁজিবার উদ্দেশে ঘরের বারান্দা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন স্নেহলতা আসিতেছে। জগৎ বাবু বলিলেন—“এতক্ষণ কোথা ছিলে?—” সে আস্তে আস্তে বলিল—“ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।”

জগৎ বাবুর স্ত্রী বলিলেন—“হ্যাঁ ডাক্তার ডাকাও, মেয়ে অসুখে সারা হয়ে গেল! ভ্যালা যাহোক আদুরে করে তুলেছ—শেখাও আরো লেখাপড়া শেখাও—মেয়েকে যে বৌ করবে—সে স্বর্গে যাবে!”

বালিকা তাঁহার বকুনি শুনিবার জন্য না দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি ভাঁড়ার ঘরে গেল।

জগৎ বাবু বলিলেন, “বড় বৌ, কি একটা দোষ হয়েছে কি না হয়েছে কেন ওকে অমন করে বকচো। ছেলে মানুষ মা বাপ নেই. তোমার কি একটু মায়া করে না?”

গৃহিনী বলিলেন—“মা বাপ নেই? মাবাপের বেশী আছে—কোন মা বাপ তোমার মত আদর দেয়, ওর ইহকাল পরকাল তুমিই খেলে?”

জগৎ। সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি কেবল ওর সঙ্গে একটু ভাল মুখে কথা কয়ো দেখি।

গৃ। আমি আদর দেওয়া সইতে পারিনে—অন্যায় দেখ্‌লে আমায় বলতেই হবে, তাতে যদি না তোমার সহ্য

হয়—তাতে যদি মেয়ের গায়ে এতই বাজে, যদি ফুলের ঘায়ে ওঁর মূর্চ্ছা আসে—ত দাও না কেন শীঘ্র বিয়ে দিয়ে, ওরও কষ্ট যাবে আমারো কষ্ট যাবে—সেই ত ভাল!

টগর ঠিক একটু আগে এখানে আসিয়াছিল; সে বলিল, "মা, দাদা বলছিল কনেদিদিকে বিয়ে করবেনা—সে বড় দুষ্টু।"

জগৎ বাবু বলিলেন, "আচ্ছা এতই তোমার অসহ্য হয়েছে ত তাই হবে!" এই বলিয়া জগৎ বাবু চলিয়া গেলেন।

গৃহিণী বলিলেন—"কোথা যাও? খেয়ে যাও।"

জগৎ বাবু বলিলেন "আমার কাজ আছে—খাবার সময় নেই।"

গৃহিণী বলিলেন—"মাথা খাও খেয়ে যাও।"

এই সময় স্নেহলতা আসিয়া জগৎ বাবুকে অনাহারে যাইতে দেখিয়া বলিল—"মেসমশায়, খাবে না?" মেসমশায় ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর করিলেন "না"।

জগৎ বাবু চলিয়া গেলেন, স্নেহলতা ভাবিল তাহার দোষেই এরূপ হইল। তাহার উপরই রাগ করিয়া তিনি খাইলেন না। তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। এই কষ্টের উপর গৃহিণী আবার বকুনি আরম্ভ করিলেন। তাহার দোষেই যে জগৎ বাবুর খাওয়া হইল না, অশেষ প্রকারে তিনি তাহাকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং বুঝাইবার ভাষা নারী-রসনার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, ভগ্নবংশী-বিনিন্দিত সুতীক্ষ্ণ সুতীব্র স্বরে এবং বজ্রকঠোর শব্দঘটায় মিলিয়া মিশিয়া সবেগে সতেজে পর্দায় পর্দায় চড়িতে

চড়িতে একই সঙ্গে গৃহের ছাদ ও স্নেহলতার হৃদয় ভেদ করিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গৃহিনীর উপর রাগ করিয়া কাজের ছুতায় ত জগৎ বাবু বাড়ীভিতর হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বাস্তবিক তখন তাঁহার কাজ কিছুই ছিল না—তিনি বাহিরে আসিয়া একটু-খানি এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইলেন তাহার পর বাড়ীর বাহির হইয়া পদব্রজে আহিরীটোলার গঙ্গার ঘাটের রাস্তার উপর আসিয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণ পক্ষ রাত্রি, দিক জ্যোৎস্নামধুর নহে, আকাশে তারকামালা, জলে স্থলে দীপমালা দীপ্তি বিকাশ করিতেছে মাত্র। এই দীপ্তির প্রভাবে কোন স্থান সমুজ্জল, কোন স্থল মৃদু-তর ভাবে আলোকিত, ইহার অভাবে কোন স্থল বহুদূরব্যাপী অন্ধকারে বিলীন। রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, গাড়ী ঘোড়া আর এ রাস্তায় চলিতেছে না, লোক জনের যাতা-য়াতও বিরল হইয়া পড়িয়াছে। দুই এক জন মেছুনি কেবল তখনো ঝাঁকা মাথায় হন হন করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিতেছে, দুই একজন চাকর চাকরাণী ইলিস মাছ হাতে বাবুদের বাড়ীর গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। ঐ নাগরা-জুতাধারী ভুঁড়িদারী মাড়োয়ারী একজন গানের উপলক্ষে

গর্দ্দভের চীৎকার করিয়া গেল, স্কুলের ছাত্র দুই জন গলাগলি করিয়া গৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে তাহাকে সাবাস দিতে আরম্ভ করিল। জগৎ বাবু তাহাদের পাশ কাটাইয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়া বসিলেন। ঘাট তখনো জনশূন্য নহে, ঘাটে কৌপিনধারী রুদ্রাক্ষশোভিত বিভূতিচর্চ্চিত সন্ন্যাসী—কেহ বা বসিয়া আছে, কেহ বা 'জয় জয় হরে মুবারে' বলিয়া জলপূর্ণ লোটাহস্তে সোপান উত্তরণ করিতেছে। স্ত্রী পুরুষ দুই একজন তখনো জলে অবগাহন করিতেছে। দু একজন যুবক সোপানে বসিয়া গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছে; গঙ্গার কুলু কুলু তটাঘাত শব্দে মিশিয়া সেই গুণ গুণ শব্দ ভ্রমর ঝঙ্কারের মত বোধ হইতেছে। দূরে ওদিকে নদীগর্ভে একজন হিন্দু মাঝি গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গাহিতেছে—

'মন-মাঝি সামাল সামাল—ডুবলো তরী
ভবনদীর তুফান ভারী।'

জগৎ বাবু গানটি ভাল করিয়া শুনিবার জন্য কাণ পাতিলেন, কিন্তু এদিকে ঘাটের পাশে তাঁহার কাণের কাছে একখানি চট্টগ্রামী মহাজনী নৌকা হইতে গান উঠিল—

''আর কুয়েলা ন ডাহিও!
বঁধু গেছেন বিদেশৎ, থৎ না লেহন ছমাসৎ,
বঁধুর লাগি মোর কলিজা জলি জলি যায়;
কোয়েলা ন ডাহিও!
বঁধু গেছন যেন্‌ডা, ডাহো কুহিল হেন্‌ডা,
হ্যানে যদি ডাহো কুহিল মোর মাথাডি খাইও!"

এই গানের মধ্যে দূরের বৈষ্ণব মাঝির গান ডুবিয়া গেল। জগৎ বাবু তাহার আর এক অক্ষরও বুঝিতে পারিলেন না। কেবল পূর্ব্ব বঙ্গীয় অপরূপ সুরতান-উচ্চারণ, বিশিষ্ট উক্ত অপূর্ব্ব কথাগুলি ক্রমাগত তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া জগৎ বাবু যখন উঠিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় সহসা চট্টগ্রামবাসীর গানও বন্ধ হইল, জগৎ বাবু আবার শুনিতে পাইলেন—

"মন-মাঝি সামাল সামাল, ডুবলো তরী,
ভবনদীর তুফান ভারী-ই-ই-ই ই।
মাঝি, তরঙ্গ হেরি সইতে নারি,
তাই তোরে জিজ্ঞাসা করি—
বল দেখি কোন মাস্তিরি শিখায় তোরে
আজগুবি এ মাঝিগিরি-ই-ই-ই ই।
তোর হেলে পেলে না জল, কি কর্‌বি বল
কেমনে জোমাবি পাড়ি!
তোর নায়ে ছয়খান দড়ি, যাচ্ছে ছিঁড়ি
ঐ দেখ পটাশ পটাশ করি!
ডুবলো তোর ভগ্নতরী, হায় কি করি
কেমনে জোমাবি পাড়ি-ই ই-ই-ই!"

জগৎ বাবু গান শুনিতে লাগিলেন, শুনিতে শুনিতে গান ভুলিয়া গেলেন, যে চিন্তায় এতক্ষণ তাঁহার মন তরঙ্গিত হইতেছিল, ধীরে ধীরে অজ্ঞাতভাবে আবার সেই চিন্তার স্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—আমি কেন ভালবাসি! সংক্রামক রোগের মত যাহার

স্পর্শ, সে কেন অন্তকে আলিঙ্গন করিতে চায়? যে বিষাক্ত কীট, যাহার স্নেহ-চুম্বনে অন্তে জর্জ্জরিত হইয়া ওঠে—সে কেন অন্তকে ভালবাসে!

বিগত জীবনের সমস্ত ঘটনা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন—যেমন সকলে গিয়াছে তেমনি স্নেহলতাও একদিন যাইবে—বাড়ী ফিরিয়া এক দিন আর তাহাকে দেখিতে পাইবেন না। জগৎ বাবুর চক্ষু জলপূর্ণ হইল—কিন্তু তিনি বলিলেন—"হউক, তাহাই হউক, স্নেহলতার পক্ষে তাহাই ভাল। আমি যে স্নেহকে আমার আপনার করিয়া আমার কাছে কাছে রাখিতে চাই, সে কেবল আমি স্বার্থপর বলিয়া বৈত নয়! তাহাতে কি স্নেহ সুখী হইবে? এখন যে এখানে সে বিশেষ সুখে আছে তাহা নহে, এখানে বিবাহ হইলে এইরূপ গঞ্জনায় তাহার চির-জীবন কাটিবে। ইহার উপর চারু যদি না ভালবাসে ত তাহার কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা!"

এতদিন জগৎ বাবুর মনে হইত চারু স্নেহকে ভালবাসে, বিবাহ হইলে স্বামীর সুখে সুখী হইয়া স্নেহ অন্ত অসুখকে তাচ্ছিল্য করিতে পারিবে। কিন্তু আজ তাঁহার অন্য রকম মনে হইতে লাগিল। টগরের মুখে আজ যখন শুনিলেন চারু স্নেহকে বিবাহ করিতে চাহে না—তখন সে কথা তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছিল। সেই কথা এখন বারবার মনে হইতে লাগিল। যদিও তিনি বুঝিলেন—চারু ছেলে-মানুষ, পরে তাহার স্নেহলতার প্রতি কিরূপ ভাব হইতে পারে ও কথা হইতে অবশ্য তাহার মীমাংসা হয় না। উহা-

দের বিবাহ হইলে উহারা যথার্থ সুখীও হইতে পারে—কিন্তু তথাপি তাঁহার মনে হইতে লাগিল—তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? বিপরীতও ত হইতে পারে। বরঞ্চ তাহারই সম্ভাবনা অধিক। মাতার ভাব সন্তানে প্রবর্ত্তিত হওয়াই স্বাভাবিক। গৃহিণী স্নেহকে ভালবাসেন না, ক্রমাগত তাহার নিন্দা করেন—এ অবস্থায় চারু স্নেহকে কিরূপে ভালবাসিতে শিখিবে! আর বাল্যকালে যে ভাব হৃদয়ে আবদ্ধ হইয়া যায়, পরে যুক্তি দ্বারা তাহা অতিক্রম করাও নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ স্নেহ প্রেম হৃদয়ের সামগ্রী, যুক্তি দ্বারা কে কবে ভালবাসা কমাইতে বাড়াইতে পারিয়াছে? এ অবস্থায় চারুর সহিত স্নেহলতার বিবাহ দেওয়া কি তাঁহার উচিত? তিনি স্থির করিলেন—না, তাহা দিবেন না।" এতদিনকার বদ্ধমূল আকাঙ্ক্ষা তিনি সবলে উৎপাটন করিতে চেষ্টা করিলেন, হৃদয় শোণিতাক্ত হইল, কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। অবশেষে স্পষ্ট বুঝিলেন—তাহা হইয়া গিয়াছে—উৎপাটিত, শোণিতসিক্ত শতমূল আকাঙ্ক্ষা ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছে, স্নেহলতা তাঁহার "পর" হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বাড়ীর মধ্যে আর সে নাই, তিনি গৃহে গেলে আর সে হাসিয়া কাছে আসে না, একটি পুষ্পের অভাবে সমস্ত সংসার এখন তাঁহার নিকট মরুময়। তিনি আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"মায়া, মায়া, সবই বৃথা মায়া!" কিন্তু তবুও মায়ার কারা ভাঙ্গিতে পারিলেন না, দরদর করিয়া তাঁহার নেত্র বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, আর মনে হইতে লাগিল স্নেহলতা কেন তাঁহার নিজের সন্তান হইল না!

অনেকবার ইহা তাঁহার মনে আসিয়াছে, কিন্তু ঠিক এরূপ মর্ম্মান্তিকরূপে ইহার সত্যতা তিনি এতদিন কখন অনুভব করেন নাই। আজ দেখিলেন—সে কোথা আর তিনি কোথায়, তাঁহাদের মধ্যে পর্ব্বতের ব্যবধান। তিনি মর্ম্মপীড়িত হইয়া ঈশ্বরকে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া পাইলেন না, বহুদিন পরে আবার মনে হইল—সত্য সত্য কি সমস্তই যন্ত্রমাত্র; আত্মা নাই, প্রাণ নাই, দয়া নাই, মায়া নাই, প্রেম নাই, করুণা নাই, যাহা দেখিতেছি ইহার বাহিরে কিছু নাই, কেহ নাই? সব যন্ত্র—যন্ত্র!

জগৎ বাবু শিহরিয়া চক্ষু মুদিলেন হঠাৎ তাঁহার কর্ণে আবার প্রবেশ করিল—

"মন মাঝি, সামাল সামাল ডুবলো তরী—
ভবনদীর তুফান ভারী!"

তিনি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মনে হইল সত্যই তরী ডুবিল, কোথায় হাল কোথায় কাণ্ডারী! তিনি পরিপূর্ণ কাতর প্রাণে গাহিলেন—

অকূল ভব সাগরে তার হে, তার হে,
চরণতরী দেহি মে অনাথনাথ হে।
সন্তাপনিবারণ, দুর্গতিবিনাশন, দুর্দ্দিনতিমির হর,
পাপতাপ নাশ হে।

বিজন গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া এক মনে এক প্রাণে অনবরত এই কয়ছত্র তিনি গাহিতে লাগিলেন। দুই একজন বিজন-বিহারী সন্ন্যাসী তাঁহার দিকে কুতূহল-নেত্রে চাহিয়া চলিয়া গেল, দুয়েকটি বিমান-বিহারী তারকা তাঁহার

দিকে করুণ-নেত্রে চাহিয়া নির্ব্বাপিত হইল। তিনি কাহারো দিকে না চাহিয়া আপন মনে কেবল ঐ গানটিই গাহিতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে তাঁহার হৃদয় সবল হইল, তাঁহার হৃদয়ব্যথা প্রশমিত হইল, এক দয়াময় কাণ্ডারীর স্পর্শ তিনি যেন অনুভব করিলেন, অকূল ভবসাগরেও তিনি কূল দেখিতে পাইলেন।

সেই রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া জগৎ বাবু গৃহিণীকে বলিলেন—

"বর খুঁজিতে বলিও, স্নেহলতার বিবাহ শীঘ্র দিব।"

নবম পরিচ্ছেদ।

স্কুলের চারিজন ছাত্র বিকালে বিডন-গার্ডনেব এক নির্জ্জন প্রান্তে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া গল্প করিতে-ছিল। কিন্তু এরূপ স্থলে যেরূপ হইয়া থাকে—শীঘ্রই তাহাদের গল্প তর্ক বিতর্কে পরিণত হইল। জীবন বাল্য-বিবাহের বিরোধী, অন্য তিনজনে মিলিয়া তাহার মতকে ধরাশায়ী করিতে প্রবৃত্ত হইল।

হেম বলিল—"আচ্ছা, বাল্য-বিবাহ সমাজের পক্ষে অশুভ, বেশ খুব বক্তৃতা কর, খবরের কাগজে লেখ, কিন্তু

তাই বলে নিজে যে কেন বিয়ে করবে না—এত আমি ভেবে পাইনে। তুই কি বলিস, কিশোরি ?"

কিশোরীর উপর হেমের অগাধ ভক্তি, কিশোরীর কথা তাহার নিকট বেদবাক্য। কিশোরী যে গতবার এণ্ট্রেন্স ফেল হইয়াছে, হেমের মতে তাহাও কিশোরীর অতিবুদ্ধির ফলে। তাহার বিশ্বাস (কেননা কিশোরী এইরূপ বলে) অধিক বুদ্ধিমানেরা পরীক্ষা সহ্য করিতে পারে না। হেম নিজেও তাহার আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় এই কথার মাহাত্ম্য রক্ষা করিবে এইরূপ সম্ভাবনা বিবেচনা করিতেছে।

কিশোরীর কথায় জীবন বলিল—"আমিত আগেই বলেছি ও সমস্তই Absurd, nonsence, hypocrisy! আসল কথা জীবনদা যেমনটি চায়—ঠিক তেমনটি পেয়ে ওঠে না। Early Marriage, Female Emancipation, Social Reformation এ সব বড় বড় কথা মুখে বেশ বলতে ভাল, সুবিধা পেলে আমিই কি বলতে ছাড়ি? সে দিন পাদরী স্মিথ সাহেব আমার radical views শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে যদি তেমন তেমন একটা জুটে যায়, রূপ আর 'রূপী' একই সঙ্গে মেলে, তাহলে কি আমি ছেড়ে কথা কই?"

নবীন। কিহে ভায়া জীবন, তাই কেন ফুটে বল না। যদি তোমার লজ্জা করে আমাকে বল্লেইতো হয়, আমি তোমার হয়ে একটা advertisement দিয়ে দিই।

কিশোরী। adver´tiesment কিহে? ad´vertisement—first syllable এ accent.।

কিশোরী এণ্ট্রেন্স-ফেল, নবীন এল, এ ক্লাশের ছাত্র—সে ও কথা মানিবে কেন? সে বলিল—"কক্ষনো না, আমাদের প্রফেসার এই রকম উচ্চারণ করেন।"

কিশোরী। প্রফেসারের বিদ্যে তাহলে বোঝা গেছে! বল দেখি ad´versary না adver´sary?

জীবন। তা অবশ্য ad´versary—কিন্তু তাই বলেই যে advertisement-এরও first syllable-এ accent হবে তার ত কোন মানে নেই। যেমন ধর in´dolence আর condo´lence, একই ধরণের কথা—কিন্তু accent দুটর দুরকম।

জীবন ইহাদের চারি জনের সর্ব্বোচ্চ ক্লাশের ছাত্র, অন্য কেহ সহজে ইহার কথা অমান্য করিতে সাহস করে না; কিন্তু কিশোরীর সে সাহস আছে।

সে বলিল—"হ্যাঁ ওটা যা বলেছ ঠিক—indo´lence আর con´dolenceই বটে, কিন্তু advertisement আর adversary-র accent যে বিভিন্ন, তা আমি কখনোই স্বীকার করব না।"

নবীন। তুমি স্বীকার কর বা না কর তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের প্রফেসার বিলাত থেকে লেখাপড়া শিখে এসেছেন!

কিশোরী। রেখে দাও তোমার বিলাত। বিলাত গেলেই ত আর লোকে বিদ্যাদিগ্‌গজ হয়ে আসে না। কৃষ্ণদাস পাল কি বিলাত গিয়েছিল? সে কি আর ইংরাজী জানে না? সে দিন থিয়েটারে দেখি একজন বিলাত ফেরত

'আঁকোর' বলছে ; আর আমি ইংরাজদের 'এন্‌কোর' বলতে শুনেছি। বল তারা ভুল বলে ?

হেম। তুই ভাই থিয়েটারে গিয়েছিলি ? কবে ? আমাকে বলতে নাই ? গোলাপী গেয়েছিল নাকি ? She has a splendidest throat I have ever heard !

জীবন। (হাসিয়া) you are the greatest ass I have ever seen.

নবীন। Splendidest throat ! বিদ্যেত দেখছি চার পো ! আমার তোকে থ্রট্‌ল্ করতে ইচ্ছা করছে !

হেম। 'থ্রোট' নাত 'নেক' বলব নাকি ?

নবীন। 'থ্রোট' ও বলবিনে, 'নেক'-ও বলবিনে—বলবি voice—আর Splendid কি কখনো ——

হেম। একই কথা ! He saw me, he eyed me দুই-ই বলা যায়, কি না ? আমি না হয় voice না বলে throat বলেছি—তাতে আর কি এল গেল ?

জীবন। এল গেল এই যে ভুল হোল।

হেম। কেন কিশোরীও ত ঐ কথা বলে ?

কিশোরী সেয়ানা ছেলে, দেখিল বেগতিক, হাসিয়া বলিল—"হেম, তুই যদি একটুও ঠাট্টা বুঝিস। বলি নবীনদা, এবারকার তোমাদের English Courseটা কি ?"

নবীন। ভুলাইনে বলব ?

আদিসেন ভানসেন মাকালি গোবরস্তথা
মুলতান হুমারশ্চৈব বলাকী বরদাভত্তা।

হেম। একি এ যে সব সংস্কৃত !

নবীন। হাহা ঐ ত মজা! বিদেশের ভাষা বুঝিস আর দেশের ভাষা বুঝিসনে?

হেম। দেশের ভাষা? এটা তোমার দেশের ভাষা হোল! তুমি বল দেখি—'নাকে মুখে কথা কয় কেবা সেই মহাশয়?' এত বাবু খাঁটি ভাষা!

নবীন। নাকে মুখেত আর কেউ কথা কয় না তুই ছাড়া।

হেম। আমাকে ভূত বল্লে? তোমাকে কিন্তু ভূত ছাড়া করব।

কিশোরী। আঃ হেম, একটু থাম্ না। নবীনদা কি বল্লে আর একবাব বল দেখি?

নবীন আর একবার পূর্ব্ববৎ উপরোক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া গেল। কিশোরী ভাবিয়া বলিল—"হ্যাঁ বুঝেছি, এই-টুকু কি আর বুঝতে পারিনে? আদিসেন অ্যাডিসন, তানসেন টেনিসন, মাকালিটাও বুঝলুম।

হেম। কি বুঝলি?

কিশোরী। কেন—মেকলে!

হেম। সাবাস বুদ্ধি! আমি বলে দিলুম কিশোরী এক-দিন যদি হাইকোর্টের জজ না হয় ত আমার নামই মিথ্যা। তাপর ভাই গোবর?

কিশোরী। গোবর আর বরদাভর্ত্তা—এই দুটতে একটু গোল বাধছে। মূলতান মিলটন—হুমর ত হোমার—

নবীন। শোন তবে কুপার থেকে গোবর—ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ থেকে বরদাভর্ত্তা। যেমন সিন্ধু থেকে হিন্দু—হাণ্ড্রেড় থেকে হান্দর—হলাঁদে থেকে ওলন্দাজ ইত্যাদি।

কিশোরী। তাহলে কালীকাটা থেকে কলিকাতা—daudy থেকে জাঁদরেল—এওত হতে পারে।

হেম। Bravo! happy, happy thought! বলি জীবন বাবু বাল্যবিবাহ সত্বেও এ সব thought বাঙ্গালী সন্তানের মাথা থেকে বার হয়!

কিশোরী। এ ত ভারী! এমন কত Original idea বাঙ্গালীর মনে এসেছে। আচ্ছা জীবনদা, আমি জিজ্ঞাসা করি, চিরকাল আমাদের বাল্য-বিবাহ চলে আসছে, তা আমাদের দেশ উচ্ছন্ন গেছে না সংসার চলছে না—কি বল দেখি?

জীবন। হাঁ সংসার চলছে বটে—কিন্তু এরূপ না চলাই ভাল। আমরা কি আবার একটা জাত? আমাদের চরিত্রের বল আছে, না মহৎকার্য্যে আত্মদান আছে—কি আছে কি? দু একজন মহৎ-চরিত্রকে কালে ভদ্রে যদি বা আবির্ভাব হতে দেখা যায়, অকাল মৃত্যু থেকে তাঁদেরও নিস্তার নেই। এ সকলের কারণ কি?

কিশোরী। কারণ ম্যালেরিয়া—আর বিদেশীয় অধীনতা। আমাদের আগেও ত বাল্যবিবাহ ছিল কিন্তু বড় লোকের ত অভাব ছিল না,—আর তারা বাঁচতও ত অনেক দিন?

জীবন। ম্যালেরিয়া আর কদিন হয়েছে? আর সব জায়গায় ত আর ম্যালেরিয়া নেই। আর বিদেশীয়ের অধীনতার কথা যদি বলিস, তারই বা কারণ কোথায়?

কিশোরী। তার কারণ বাঙ্গলার জল বাতাস—

হেম। তার কারণ বাঙ্গালীর স্বভাব—

জীবন। তার কারণ বাঙ্গালীর শিক্ষা—rather শিক্ষার অভাব। স্ত্রীলোকদের নিকট হতেই মানুষের চরিত্র গঠিত হয়, আমাদের স্ত্রীলোকেরা যদি সুশিক্ষিত হতেন, আমরা যদি তাঁদের সহিত উপযুক্ত ব্যবহার করতে জানতুম—তা হলে আর আমাদের এ রকম দুর্দ্দশা হোত না।

কিশোরী। রেখে দাও তোমার স্ত্রী শিক্ষা—আর স্ত্রী মর্য্যাদা! শাস্ত্রকারগণ কি তোমার চেয়ে নির্ব্বুদ্ধি ছিলেন—তাঁরা বলেন—

"বিশ্বাস নৈবং কর্ত্তব্য স্ত্রীংষু রাজ কুলেংষুচ।"

নবীন। সংস্কৃততেও দেখছি পণ্ডিত হয়ে উঠেছিস!

বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজ কুলেষু চ।

জীবন। শাস্ত্রে অন্য কথাও ত অনেক আছে তা তোমরা মান কই? বিধবা বিবাহ ত শাস্ত্রসম্মত বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমাণ করেছেন—তবে কেন বিধবা বিবাহে এত কুণ্ঠিত?

কিশোরী। বিধবা বিবাহ! কি একটা কথা আছে—আচার আচার—

নবীন। আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং—

কিশোরী। আমি জানি, কেবল মনে পড়ছিল না। তা আচার ত ছাড়া যায় না। শাস্ত্র না হয় বিধবা বিবাহের পক্ষে—কিন্তু হলে কি হয়—আচার যে এখন দাঁড়িয়েছে আর এক রকম!

জীবন। তাই আচারের নামে আমরা সহস্র দুরাচার

অনুষ্ঠান করছি। এর চেয়ে silliness, foolishness আর কোন nationএ দেখতে পাবে না।

নবীন। তুমি অন্যায় বলছ। এ রকম foolishness সব নেসনের মধ্যেই দেখা যায়। ইংরাজেরা দেখ শাস্ত্রের মান্য রক্ষার জন্য কত লোক পুড়িয়েছে। আসল কথা পুরাতনের প্রতি লোকের এমনি শ্রদ্ধা যে sentiment এখানে বুদ্ধির লাগাম মানে না।

জীবন। False sentiment!

নবীন। মানুষ যখন imperfect তখন তার আর বিচিত্র কি!

জীবন। কিন্তু এই imperfection নিয়ে যে সন্তুষ্ট থাকে, এ'কেই যে perfection বলে জানে, সেত আর কখনো মানুষ নামেরো যোগ্য হতে পারে না।

নবীন। তাহলে ইংরাজরাও মানুষ না?

জীবন। false sentiment যে ইংরাজদের নাই তা নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে সত্যের প্রতি অনুরাগটা এত প্রবল যে এরূপ মিথ্যাকে তারা অতিক্রম করে ওঠে, অন্ততঃ তাদের সেইদিকে লক্ষ্য দেখা যায়। কিন্তু আমাদের আদি যুগ হতে একাল পর্য্যন্ত কেবল অন্ধবিশ্বাস—পরের ল্যাজ ধরে চলা অভ্যাস। এ কিরূপ injustice বল দেখি—স্ত্রীলোক আর শূদ্র—

নবীন। তুমি এখনকার চোখে তখনকার কালকে বিচার করছ; এখানে absolute ন্যায়ান্যায় দেখলে ত চলবে না, তখনকার কালের পক্ষে সমাজে ঐরূপ বিধান হয়ত absolutely আবশ্যক হয়েছিল।

জীবন। বেশ—কিন্তু এখন ত আর সে কাল নেই—সে অবস্থা নেই—এখনো কেন তোমরা তবে অন্ধ হয়ে থাকতে চাও? সেই সংস্কার—সেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে চল।

হেম। রেখে দাও তোমার বক্তৃতা! ভারী উনি মস্তলোক—না? তাই শাস্ত্র ছেড়ে ওঁকে মানতে হবে!

কিশোরী। দাদা, রুষ্ঠ হয়োনা, তুমি ডুলাইন বাঙ্গালা লিখে শাস্ত্র ওলটাতে পারবে না।

জীবন। সে ভাবনা করিসনে, আমি শাস্ত্র ওল্টাচ্ছিনে—বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শুনলেই থমকে যেতে হয় তা আবার শাস্ত্র? 'রুষ্ঠ'র মানে কি কিশোরি?

হেম। সত্যি নাকি! রুষ্ঠ কথাটার মানে জান না, আবার বাঙ্গালা লেখ! 'রুষ্ঠ' জান না—উষ্ট কাকে বলে জান? 'উষ্ট্র'ও যা 'রুষ্ঠ'ও তাই। হায় হায় আমাদের দেশের এমনি 'দুরাবস্থাই' বটে!

নবীন। তোদের কথার আকারেতেই তা প্রকাশ পাচ্ছে। ওহে কিশোরি, এত দেশ দেশ করিস আর দেশের ভাষাটা একটু শিখিসনে!

কিশোরী। আমি দেশের ভাষা জানিনে?

নবীন। এই না বল্লি 'রুষ্ঠ'?

কিশোরী। তা না ত কি?

নবীন। রুষ্ট।

কিশোরী। আমি ত তাই বলেছিলুম—দাদা বল্লে 'রুষ্ঠ'। আমাকে আবার উনি ভাষা শেখাতে আসেন?

হেম। আর বাঙ্গালা শিখেই বা কি হবে—বৃথা পরিশ্রম!

বাঙ্গালা ভাষা ত আর বেশী দিন টিকচে না। যা শেখবার তাত শিখেছে। বলি কিশোরি, এবার কি এণ্ট্রেন্স দেবে ?

কিশোরী। ঠিক বলতে পারছিনে। একটু juxta positionএ পড়েছি।

জীবন। কি রকম ?

কিশোরী। দাদা ত পড়া নিয়ে ব্যস্ত, বাবাও আর পেরে ওঠেন না—জমীদারীতে একটা হেঙ্গাম বেধেছে, বোধ হচ্ছে আমার না গেলে চলবে না। একটা Equitorial mortgage—

জীবন আর নবীন উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, কিশোরী থামিয়া বলিল, "এতে হাসির কথা কি ?"

জীবন। কিছু না—এই যে মোহনদা আসছে।

কিশোরী। তাইত দাদা আসছে। আমি যাই, এথনি লেকচার ঝাড়বে এথন, আয় হেম।

মোহন এদিকে আসিতে আসিতে হেম ও কিশোরী বাগান পার হইয়া গেল। জীবন ও নবীন মোহনের কাছে আসিয়া বলিল, "এইযে মোহনদা, থবর কি ? কবে শিবপুর থেকে এলে ?"

মোহন। এই ভাই এক রকম। কাল এসেছি। আবার কাল যেতে হবে। এত হাসি চলেছিল কেন ?

নবীন। ওহে ভাই তোমার ভায়ার Equitorial mortgage-এর মধ্যে পড়ে বড়ই juxta positionএ পড়েছিলুম।

মোহন বুঝিল ব্যাপার থানা কি ; বলিল, "ওটার বিদ্যা ঐ পর্য্যন্ত হয়েছে, কিছুতেই আর ওর কিছু হোল না।"

জীবন। বুদ্ধি শুদ্ধি কিন্তু মন্দ ছিল না—পড়লে শুনলে বেশ হোত।

মোহন। বাবা আর জ্যেঠাইমা আদর দিয়ে দিয়েই ত ওর মাথা খেলেন। পড়াশুনা আর হয়েছে!

জীবন। মোহনদা, তুমি যে বলেছিলে সই করবে?

মোহন। কিসে? Early marriage pledgeএ?

জীবন। হঁ্যা।

মোহান। ভেবে দেখলুম সেটা না করাই ভাল। কেন না জানছি যে তা পেরে উঠব না।

জীবন। তোমার ত প্রায় ১৯ বছর বয়স হোতে চল্লো—আর দুবছর বই ত নয়?

মোহন। যে রকম বিরক্ত করে তুলেছে—দুবছর ছাড়া দুমাস আর পোহাতে দেবে এমন মনে হয় না।

নবীন। জীবন, তুমি যে বাল্যবিবাহ বাল্যবিবাহ করে ক্ষেপলে! সকলেরি use আর abuse দুই আছে। আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা তাতে হঠাৎ বাল্যবিবাহ উঠিয়ে দিলে যে ভাল ফল হবে এমন বলা যায় না। আর যদি বাল্য-বিবাহ বন্ধ হওয়াই আবশ্যক হয় ত ক্রমে আপনিই হবে; তার জন্য তোমার আমার অত মাথা ভাবাবার আবশ্যক নেই।

জীবন বলিল—'তাহলে কিসেরই বা আবশ্যক আছে? আমরা সকলে চুপ চাপ বসে থাকি, অদৃষ্টে যা হবার আপ-নিই হবে। পড়া শুনাই বা কেন, উপার্জ্জনের চেষ্টাই বা কেন? কিছুরি ত তাহলে আবশ্যক নেই!"

বাল্য-বিবাহের পরিবর্ত্তে অদৃষ্টবাদ লইয়া আবার তাহাদের তর্ক আরম্ভ হইল এবং পূর্ব্বের ন্যায় কোন মীমাংসার পূর্ব্বেই ইহাও অসময়ে সমাপ্ত হইয়া গেল। ইহার পর আরো একটা তর্ক উঠিবার সূত্রপাত হইয়াছিল ; কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া পড়িল, মৃদু চন্দ্রালোকে চারিদিক শোভিত দেখিয়া পুস্তকের বিরহে তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিল, এই মুক্ত জ্যোৎস্নাময় দৃশ্য অপেক্ষা তাহাদের মলিন তৈল-দীপালোকিত ক্ষুদ্র কোটর অধিকতর রমণীয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল, তাহারা দ্রুতপদে গৃহাভিমুখী হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

জীবন বিবাহ করিতে চাহে না, জীবনের মা-র ইহাতে বড়ই দুঃখ। জীবন কিছু নিতান্ত ছেলেমানুষ নহে, বয়স প্রায় ১৯ বৎসর হইতে চলিল, দু দুইটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, অন্য ছেলে হইলে এতদিন কোন্ কালে তাহার বিবাহ হইয়া যায়। জীবনের মারও ইচ্ছা অন্য সকলের ন্যায় তিনিও জীবনের এখনই বিবাহ দেন, তাঁহার কন্যা নাই, পুত্রবধূকে লইয়া তিনি কন্যার সাধ পূর্ণ করেন। কিন্তু জীবন কিছুতেই বিবাহে রাজি হয় না, কত বড় বড় ঘর হইতে সম্বন্ধ আসিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া যায়। জীবন যত বড়

হইতেছে, পাশ্চাত্য মহচ্চচরিত্রের সহিত যতই সে অধিক পরিচিত হইতেছে, ততই তাহার প্রাণের মধ্যে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে, আর দেশের সামাজিক রীতি নীতি সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের পক্ষে ততই যেন তাহার প্রতিকূল বলিয়া মনে হইতেছে। দিন কতক সে বিলাত যাইবার জন্য ভারী ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পরে বুঝিল সে' বাসনা এখন তাহার পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত। এখন সে পরের বৃত্তিভোগী, তাহার পিতৃব্য অনুগ্রহ স্বরূপ তাহাদিগকে মাসে মাসে যৎকিঞ্চিৎ যাহা দান করেন, তাহাতে তাহাদের যথেষ্ট হয় না। জগৎ বাবু যদি বিনা ভাড়ায় তাহাদিগকে থাকিবার স্থান না দিতেন—তিনি যদি নানারূপে তাহাদের সাহায্য না করিতেন, তবে তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। এ অবস্থায় বিলাত যাইবার ইচ্ছা এখন তাহার দুরাশা মাত্র। আপাততঃ জীবন সে বাসনা ত্যাগ করিল—কিন্তু তাহাতে তাহার মনের অতৃপ্তি বাড়িল বই কমিল না, তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা একটা অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট আকারে তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। এ অতৃপ্তি সে বিদ্যানুশীলনে ডুবাইতে চেষ্টা করিত। ভবিষ্যতের স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য বিদ্যানুশীলন যদিও এখন তাহার একটি প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছিল তথাপি কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে পাঠাভ্যাস করিয়াই যে সে ক্ষান্ত থাকিত এমন নহে, পুস্তকের সহবাসে জীবন যথার্থ আনন্দ উপভোগ করিত। মনের মত একখানা নূতন বই পাইলে সে না পড়িয়া থাকিতে পারিত না। ইহাতে তাহার আবশ্যকীয় পাঠের অনেক সময় বরঞ্চ ক্ষতিও হইত।

সাহিত্য এবং বিজ্ঞান এই দুই বিষয়ের পুস্তক জীবন অধিক পড়িত। দুইই তাহার এত ভাল লাগিত যে যখন যে বিষয় আলোচনা করিত, তখনকার মত তাহার মধ্যে সে একেবারে ব্যাপৃত হইয়া থাকিত, এবং উভয়ের সম্পূর্ণরূপ স্বাতন্ত্র্য সত্বেও উভয়ের মধ্যে সে যেন একই সাদৃশ্য দেখিতে পাইত।

কাব্য, উপন্যাসাদির উদার অসীম কল্পনার মধ্যে বিজ্ঞানের জ্বলন্ত সত্য সে যেন প্রত্যক্ষ করিত, মনুষ্য চরিত্রের অগাধ মন্থিত রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দর্শনের উচ্চ গূঢ় জ্ঞান লাভ করিত, সংসারের মঙ্গল অমঙ্গল পাপ পুণ্যের প্রতিঘাতে সৃষ্টির অনন্ত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইত। আদর্শ উচ্চ চরিত্রের সহবাসে একটা জীবন্ত সম্মিলন-সুখ অনুভব করিয়া সেই আদর্শ অবলম্বন করিতে তাহার প্রাণগত একটা ইচ্ছা জন্মিত। আবার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র সত্যের মধ্যেও সে কল্পনার বিপুল দ্বার উন্মুক্ত দেখিত, বিজ্ঞানের সীমায় প্রকৃতির অসীমতা অধিকতর সুস্পষ্ট দেখিয়া তাহার মধ্যে এক বিস্ময়জনক কবিত্ব সৌন্দর্য্য অনুভব করিত, সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-জীবনের প্রতি তাহার অসীম শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হইত। তাহার ইচ্ছা হইত সে ঐরূপ জীবন অবলম্বন করে। কেন সে যদি য়ুরোপে গিয়া সেখানকার কোন পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, এবং সেখানে অনবরত অধ্যবসায় সহকারে বিজ্ঞান চর্চ্চা করে, তাহা হইলে কি সে সিদ্ধকাম হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে না, এবং তাহার জ্ঞানে ভারত-

বর্ষের উপকার সাধিত হইবে না? কেন হাক্‌সলি আগে কি ছিলেন? তিনি ত কেবল অধ্যবসায়ের বলেই ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন।

যৌবনের অনভিজ্ঞতা এবং উৎসাহে সে এইরূপে তাহার আশা সফলতার পক্ষে অন্য কোন প্রতিবন্ধক দেখিতে পায় না; ইয়োরোপ যাওয়া মাত্র কেবল যেন অপেক্ষা! যেখানে কোপার্নিকস, গেলেলিও, নিউটন জন্মিয়াছেন, যেদেশ শত সহস্র মহালোকের জন্মভূমি, তাহার চক্ষে তাহা কামরূপ, তাহার স্পর্শে যেন অন্ধও দিব্য চক্ষু লাভ করে! সুতরাং ইংলণ্ড যাইবার পক্ষে এখন সে যতই প্রতিবন্ধক দেখে, ততই সে ভবিষ্যতের মুখের দিকে চাহে, উপার্জ্জন সক্ষম হইলে সে যে এক দিন য়ুরোপে যাইবে, ইহাতে সে দৃঢ়সঙ্কল্প। মাঝে মাঝে বিবাহের অনুবোধ করিয়া মা তাহার এ সুখস্বপ্ন ভাঙ্গাইতে চাহেন। জীবন বেশ জানে একবার বিবাহেব নিগড় পরিলে তাহার ভবিষ্যতের সমস্ত আশা বিফল হইবে। সুতরাং মাতার এই অনুরোধে বিবাহের প্রতি তাহার অধিকতর বিতৃষ্ণা জন্মে এবং তর্ক করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচলিত বিবাহ রীতির বিপক্ষতা অবলম্বন করে। কেবল তাহাই নহে, জীবন মাতার অনুরোধের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাল্য-বিবাহ-নিবারণী এক সভা সংগঠিত করিয়াছে। তাহার মাষ্টার পণ্ডিত প্রভৃতি অনেকেই এ সভার হিতাকাঙ্ক্ষী সভ্য, কিন্তু তাহাতে সভার উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না, কেন না তাঁহারা সকলেই বিবাহিত, ইহার মধ্যে অবিবাহিত একমাত্র জীবন।

তবে ভবিষ্যতে ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে এমন আশা করা যায়। সভার নিয়ম এই যে, কোন অল্প বয়স্ক অবিবাহিত ব্যক্তি ইহার সভ্য হইলে—তাহাকে অন্ততঃ ২১ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিতে শপথবদ্ধ হইতে হইবে। জীবনের ইচ্ছা ছিল ২১শের পরিবর্ত্তে ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রম এই শপথের সীমা হয়, কিন্তু এ প্রস্তাব কিছুতেই গ্রাহ্য হইল না। যাহা হউক জীবন শপথ গ্রহণ করিয়াই যে মাতার অনুরোধের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছে তাহা নহে, তিনি সমানই কান্না কাটা করিয়া জীবনকে বিরক্ত করিয়া তোলেন।

জীবন যে নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক তাহা নহে—বরং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অপরাধীকে ন্যায্য দণ্ড দিতেও সব সময়ে সে পারিয়া উঠে না। একদিন জীবন গৃহে আসিয়া দেখিল তাহার চাকর আয়নার সমুখে দাঁড়াইয়া তাহার বুরুষ লইয়া চুল আঁচড়াইতেছে, জীবনের ভয় হইল পাছে চাকর তাহাকে দেখিতে পায়! না জানি তাহা হইলে সে কিরূপ লজ্জিত হইবে! এই ভাবিয়া সে নিজেই লজ্জিতভাবে অপরাধীর মত আস্তে আস্তে সসঙ্কোচে সেখান হইতে চলিয়া গেল—এবং পরে সে কথার উল্লেখ পর্য্যন্তও করিল না, কেবল সেই দিন হইতে বুরুষখানি তাহার ডেস্কের মধ্যে স্থান পাইল।

একদিন জীবন অপর কয়েকজন সমবয়স্ক ছাত্রের সহিত কিশোরীদের গঙ্গাতীরের বাগানে বেড়াইতে গিয়া গঙ্গাস্নান করিতেছিল। কিশোরী ও জীবন দুজনেই সবল শরীর,

'যুদ্ধংদেহি' বলিয়া উভয়ে হাসিতে হাসিতে কুস্তির ভান আরম্ভ করিল। হঠাৎ কিশোরী আত্মবিস্মৃত হইয়া জীবনকে জলে চুবাইয়া ধরিল। জীবন তাহার হাত ছাড়াইয়া কষ্টে যখন উপরে মাথা তুলিল, তখন তাহার সোপানাহত ওষ্ঠ হইতে দর দর করিয়া রক্তধারা বহিতেছে। জীবন ক্রুদ্ধ, বিস্মিত হইয়া কিশোরীকে কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু তার আগেই কিশোরী বলিল "দাদা লেগেছে? দৈবাৎ দৈবাৎ!" জীবন অমনি থামিয়া গেল, বুঝিল কিশোরী কি ভয়ানক অপ্রস্তুত হইয়াছে, ক্রোধের পরিবর্ত্তে সে নিজে লজ্জিত হইয়া পড়িল। অন্য সকলে কিশোরীর দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষে চাহিল, কিন্তু জীবন স্পষ্ট মিথ্যা করিয়া বলিল, "কিশোরি, কিছু না কিছু না অতি সামান্য, হঠাৎ পড়ে গেলুম, কেমন পা পিছলে গেল, কিন্তু বিশেষ কিছু হয়নি—অতি সামান্য!"

কিশোরী যে কিছু করে নাই, জীবন আপনার দোষে পড়িয়া সামান্য আহত হইয়াছে, নানারূপে জীবন এই কথাটা সকলকে বিশ্বাস করাইতে আগ্রহবান্ হইল।

অন্যকে সামান্য কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য জীবন অনেক সময় এইরূপ অন্যায় করিয়া থাকে, এ সম্বন্ধে জীবনের একটা বিশেষ দুর্ব্বলতা আছে। কিন্তু সে বিবাহ করে না বলিয়া মা যে এত কষ্ট পান, সে জন্য তাহার কিছুই দুঃখ হয় না। কথাটা এই, জীবন নিজে যেরূপ স্থলে পড়িলে কষ্টে লজ্জায় পড়িত সেইরূপ স্থলেই তাহার মমতা হয়, অন্যস্থলে সে অন্ধ। সে বিবাহ না করিলে মা যে কেন

কষ্ট পাইবেন—ইহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং সে দিন বাড়ী আসিবামাত্র আবার মা যখন বলিলেন—"বাবা, বিয়ে কর না;—দিব্যি মেয়ে"—তখন জীবন আর একবার বিরক্ত হইল, এবং আর একবার তাঁহাকে বাল্য বিবাহের বিপক্ষীয় যুক্তি সকল আনুপূর্ব্বিক বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইল। মা খানিকটা শুনিয়া বলিলেন, "তা বাবা আমাদের সকলেরি ত ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছে—আমরা কি আর মানুষ হইনি?"

জীবন বলিল—"বাল্য বিবাহ প্রচলিত না থাকলে আমরা আরো বড় মানুষ হতে পারতুম।"

মা। তা বড় মানুষ এখনো অনেক আছে। শোন বাছা, টাকা কড়ি অনেক পাবি—মেয়েটিও বেশ।

জীবনের মার বিশ্বাস জগৎ বাবু স্নেহলতাকে যেরূপ ভালবাসেন—তাহাতে গৃহিণী যাহাই বলুন—তিনি বেশ ভালরকম করিয়াই তাহাকে দান করিবেন। জীবন এই কথায় রাগিয়া গেল—বিবাহ করিয়া টাকা লইতে তাহার ঘৃণা বোধ হইত, সে ভাবিত যদি সে বিবাহই করে ত ভালবাসিয়াই বিবাহ করিবে। আমাদের দেশের পক্ষে তাহা সম্ভব কি না ইহা তাহার মনে আসিত না। এতক্ষণ সে প্রকৃতিস্থ হইয়া কথা কহিতেছিল—এবার রাগিয়া বলিল—"ভরসা করি আমি নিজেই টাকা কড়ি এনে তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারব—বৌয়ের টাকায় তোমার বড় মানুষ হ'তে হ'বে না।"

জীবনের মা বলিলেন—"তা টাকা নাই নিস্ অমনি বিয়ে কর্।"

জীবন। একশবার ঐ কথা? জানত আমার লেখা-পড়া শেষ না হ'লে আমি বিবাহ কর্‌ব না, নিদেন আর ছবছর পর্য্যন্ত ত আমার হাত পা বাঁধা।

বলিয়া জীবন পাশ কাটাইবার ইচ্ছায় বলিল, "এখনি নবীন আসবার কথা আছে আমি বাইরে যাই"—

জীবনের মা তবু বলিলেন, "মেয়েটি বড় সুন্দর, আচ্ছা একটিবার তুই দেখ—"

মায়ের শেষ কথায় তাহার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল—"কেমন সুন্দর?" অবশ্য বিবাহের জন্য নহে, সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক যে আকর্ষণ—সেই আকর্ষণোৎপন্ন কৌতূহল চরিতার্থের জন্য। জীবনের অনেক রকম দুর্ব্বলতা আছে, সৌন্দর্য্যানুরাগ তাহার মধ্যে আর একটি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না—তাহা হইলে মা আবার বাড়াবাড়ি করিয়া বসিবেন। সে কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল।

জীবনের মা আবার দুঃখ করিতে লাগিলেন—তাঁহার নিতান্তই পোড়া অদৃষ্ট—নহিলে বিধবাই বা কেন হইবেন! স্বামী থাকিলে কি ছেলে এমন কথার অবাধ্য হইতে পারিত? কান্নাকাটি করিয়া একটু ঠাণ্ডা হইবার পর একটি কথা তাঁহার মনে আসিল। জীবন রাত্রে গৃহে আসিতে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা জীবন, তুই যদি না বিয়ে করিস ত মোহন কেন করুক না, অমন মেয়ে হাত ছাড়া হবে?"

মোহন ও কিশোরী জীবনের পিতৃব্য সন্তান। জীবনের পিতা বর্ত্তমানে তাঁহারা যখন এক পরিবারভুক্ত ছিলেন,

তখন চারি মাস আগে পরে মোহন ও জীবনের জন্ম হয়। সন্তান প্রসবের কয়েক মাস পরে মোহনের মাতা রোগগ্রস্ত হওয়ায় জীবনের মা তাহাকে নিজ দুগ্ধে পালন করেন। সুতরাং মোহনকেও তিনি মাতৃ-চক্ষেই দেখিতেন।

মায়ের কথায় জীবন বলিল, "আঃ কি যে তোমার খাতিক! তা আমি কিছু জানিনে, তোমার যা ইচ্ছা তুমি কর।" জীবনের মা দেখিলেন জীবনকে এ কথা কিছু না বলাই ভাল। তিনি নিজের সঙ্কল্প মতে কাজ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাহার পরদিন জগৎ বাবুর স্ত্রীর কাছে গিয়া স্নেহের সহিত মোহনের বিবাহের সম্বন্ধ পাড়িলেন। বলিলেন, "ছেলেটি বড় ভাল, ছেলেবেলা হ'তে মানুষ করেছি; সব জানি, সে যেমন কথার বশ, আমার জীবন তেমন নয়; তবে আমার যা—মোহনের জ্যেঠাই কিছু রুক্ষ-স্বভাব। তা মেয়েমানুষের স্বামী ভাল হলে তাতেই কি আসে যায়?

গৃহিণীর ইচ্ছা, কোনরূপে স্নেহলতার বিবাহটা হইয়া গেলে হয়; অথচ ভাল বর না হইলে কিছু জগৎ বাবু বিবাহ দিবেন না—সুতরাং তিনি এই সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইয়া জীবনের মার কথায় সম্পূর্ণ সায় দিলেন, এবং সেই দিনই কর্ত্তার কাছে মোহনের কথা পাড়িলেন—কেবল তাহার জ্যেঠাইমার স্বভাব সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন সে কথাটা বাদ রাখিলেন। কর্ত্তা কুঞ্জবাবুর বাড়ীর ডাক্তার ছিলেন, সুতরাং সে বাড়ীর কেহই তাঁহার অপরিচিত নহে। তিনি মোহনকে বেশ ভাল ছেলে বলিয়াই

জানিতেন, ইহার পর আরো ভাল করিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা আলাপ আরম্ভ করিলেন, তাঁহার পরীক্ষায় মোহন পাশ হইল। ইহার সহিত বিবাহ হইলে স্নেহ সুখী হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল, তিনি গৃহিণীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। জীবনের মা গৃহিণীর নিকট তাহা শুনিয়া কিশোরীকে একদিন ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর যে অবধি দেবর তাঁহাদের সম্পত্তি বেদখল করিয়া তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন, সে অবধি আর জীবনের মা দেবরের বাড়ী যান নাই। দেবরও কখনো তাঁহাদের নিমন্ত্রণ কি তত্ত্বতল্লাস করেন নাই। কিন্তু এজন্ত মোহন কিশোরীর সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ঘোচে নাই। তাহাদের তিনি প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতেন, ডাকিয়া পাঠাইতেন, খোঁজখবর লইতেন। মোহনের বাবা কিন্তু তাহা জানিতেন না—জানিলে আসিতে দিতেন কি না সন্দেহ। তাঁহার ভয়ে জীবনকে কখনো মোহন কিশোরী বাড়ী লইয়া যাইতে পারিত না।

কিশোরীকে ডাকিয়া তিনি মোহনের বিবাহ প্রস্তাব করিলেন—বলিলেন, "মেয়ে দেখতে ভাল, দেবে থোবে ভাল, ঘর হবে ভাল—সব ভাল। দিদিকে বলো যেন হাত ছাড়া না করেন। জীবন এখন বিয়ে করবে না, নইলে আমার ইচ্ছা ছিল ঐ মেয়ে করি।"

কিশোরী বলিল—"মেয়ে ভাল, দেবে থোবে ভাল, বুঝলুম, কিন্তু ঘর ভাল কি করে বলি, মেয়ের ত বাপ মা নেই—

জীবনের মা বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"এই দেখ ! বাপ মা নেই তা জগৎবাবু যে বাপ মার চাইতে বেশী। আর মামা ত রয়েছে—বড় মানষের ছেলে, ছেলে পিলে নেই, বৌটা বাঁজা—স্বভাবটা তার তাই কেমন এক রকম হয়ে পড়েছে, তাইসিন খোঁজ নেয় না, চির দিন ত আর এমন থাকবে না, ঐ মেয়েকে দেখিস কত আদর করে নেবে।"

এ কথার পর এ বিবাহে আর কোন আপত্তি প্রকাশ না করিয়া কিশোরী সেই দিনই এই সম্বন্ধের কথা জোঠাইমাকে গিয়া বলিল। এদিকে জগৎ বাবুর বাড়ী হইতে ঘটকীও আসিয়া উপস্থিত হইল। দিনকতক পরস্পর কথাবার্ত্তা চলিল, বরের বাপ মস্ত হাঁক হাঁকিয়া বসিলেন, গহনা দানপত্র নগদ টাকার লম্বা ফর্দ্দ ধরিয়া দিলেন। কন্যাপক্ষ হইতে তাহার কষাকষি চলিতে লাগিল, অবশেষে মাঝামাঝি একটা রফা হইয়া গেলে, বরপক্ষ কন্যাপক্ষ উভয় পক্ষ হইতে পাকা দেখা হইয়া গেল। আগামী ১৫রই ফাল্গুনে বিবাহের দিন ধার্য্য হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

স্নেহলতার বিবাহ হইয়া গেল। জগৎ বাবুর ভগিনী-পতি—স্নেহলতার মামা তাহাকে সম্প্রদান করিলেন; জগৎ বাবু তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শুধু অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন; ইহাতেই মাত্র তাঁহার অক্ষত অধিকার। পরদিন প্রাতঃ-কালে কুশণ্ডিকা হোম যজ্ঞাদিও এইখানে সম্পন্ন হইল, পরে মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বর কন্যার বিদায়ের আয়োজন হইতে লাগিল।

কন্যা বিদায়ের দিন বাঙ্গালী গৃহে কিরূপ নিরানন্দ তাহা সকলেই জানেন। যদিও স্নেহলতা বাড়ীর ঠিক কন্যা নহে—তবু সে কন্যার মতই হইয়া গিয়াছিল; গৃহিণীর এত-দিন তাহার উপর যে আক্রোশ ছিল—আজ তিনিও তাহা ভুলিয়া গেলেন, দোষের পরিবর্ত্তে স্নেহলতার গুণই সব আজ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। যখন কন্যা জামাতা সিঁড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—তিনিও চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "স্নেহ, আজ ঘর শূন্য করে চল্‌লি বাছা?"

স্নেহলতা ত সমস্ত দিন ধরিয়া কাঁদিতেছিল—গৃহিণীর সস্নেহ বাক্যে তাহার ক্রন্দন আরো উথলিয়া উঠিল। দাস দাসীগণ এতক্ষণ নীরবে চোখ মুছিতেছিল—এইবার তাহা-দের হৃদয়ের শুভ কামনা অর্দ্ধোচ্চারিত অস্ফুট ভাষায় ব্যক্ত হইতে লাগিল, 'সুখে থাক, পাকা মাথায় সিঁদুর পর', 'সুখে স্বামীর ঘর কর'—'হাতের নোয়া ক্ষয় যাক' ইত্যাদি আশী-র্ব্বাক্য চারিদিক হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল।

টগর স্নেহকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, চারু কাঁদিল না, কিন্তু তাহার মুখেও কষ্টের ভাব প্রকাশ পাইতে-ছিল। জগৎ বাবুর মূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা বিষণ্ন; জগৎ বাবু স্নেহলতার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"বৎসে, স্বামী-গৃহে গিয়া সুখী হও, শ্রী তোমার অনুবর্ত্তী হউন, দুঃখ ক্রন্দন তুমি এইখানে ত্যাগ করিয়া যাও, তোমার চরণস্পর্শে তোমার শ্বশুরালয় প্রফুল্ল হইয়া উঠুক।"

ক্রন্দন আশীর্ব্বাদের মধ্যে স্নেহলতা পাল্কীতে গিয়া উঠিল—ক্রন্দনের অন্ধকার লইয়া সে শ্বশুরগৃহে প্রথম পদার্পণ করিল।

বর কন্যার সহিত বাদ্যের আড়ম্বর ছিল না, জন কয়েক আসাসোটাধারী বরকন্দাজ দুই চারি জন দাসী এবং দুইখানি জুড়িগাড়ী—এইমাত্র বর কন্যার সহযাত্রী। ইহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য দুই দল বাদক বহুক্ষণ হইতে দরজি পাড়ার গলির মোড়ে অপেক্ষা করিতেছিল, গাড়ীর মাথায় লালকাপড়ের নিশান দেখিয়াই তাহারা বাজনা বাজাইয়া উঠিল, গলির শেষেই বরের বাড়ী। বাড়ীর বারান্দায়, উঠানে, ছাতে লোক পরি-পূর্ণ, গলির মোড়ে যেমন জোরে বাজনা বাজিয়া উঠিল, অমনি চারিদিকে 'বর আসছে', বর আস্‌ছে এই অভিনন্দন বাক্য ধ্বনিত হইল, আর চতুর্দ্দোলা গলির মোড়ে পৌঁছিবার অগ্রেই বাড়ীর মধ্যে একটা ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। উপরের লোক নীচে নামিতে আরম্ভ করিল,—নীচের লোক কেহ মোড়ের দিকে ছুটিল—কেহ অন্তঃপুরাভিমুখে চলিল।

রমণীগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, আর কণ্ঠধ্বনি একই সঙ্গে উত্থিত হইতে লাগিল।

বাড়ীর কর্ত্রীঠাকরুণ - ব্রতউপবাসপীড়িতা, জীর্ণ-দেহা, শীর্ণমুখী, দীর্ঘনাসা, মুণ্ডিতকেশা, (সম্প্রতি তীর্থ করিয়া আসিয়াছেন) লম্বগ্রীবা,—রুক্ষগৌরবর্ণা, উগ্রা—অৰ্দ্ধবয়সী প্রৌঢ়া—বিরক্ত বিকৃত মুখে চীৎকার করিতে লাগিলেন—'ফুঁ দে—ফুঁ দে—বৌ এসে পড়লো, দুধ যেন ঠিক সময়ে ওৎলায়।"

কোমল সুশ্যামাঙ্গী প্রফুল্লমুখী হাস্যময়ী জীবনের মা আনন্দোৎসুক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন—"দিদি, বৌকে কোলে করবে কে? তুমি না আমি?"

ঠাকুরঝি চীৎকার করিতে লাগিলেন—"ও বড় বৌ ও মেজ বৌ—খই কই? কড়ি কই? জলের ঝারি কই? বৌ যে এলো!"

যে সকল সধবাগণ ঐ সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাঁহারা চীৎকার করিতে লাগিলেন—"সব ঠিক আছে, আমরা দাঁড়িয়ে আছি।"

নিতান্ত সুব্যবস্থাশীল বাড়ীতেও এই সময় এইরূপ অব্যবস্থা দেখা যায়। যাহা হউক এই সকল গোলযোগ, অব্যবস্থা, আনন্দ ঔৎসুক্যের মধ্যে বর কন্যার চতুর্দ্দোলা ও পাল্কী বাড়ীর উঠানে আসিয়া থামিল। আজ আনন্দের দিন, বাহিরের দর্শকদিগকে উপেক্ষা করিয়া কুলরমণীগণ আজ উঠানে পাল্কীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জীবনের মা আর তাঁহার যা'য়ের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই পুত্রবধূকে পাল্কী

হইতে উঠাইয়া ক্রোড়ে লইলেন, এবং বরকে নামিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে বলিলেন। আল্পনা অঙ্কিত পথ মাড়াইয়া খই কড়ি জল ছড়াইতে ছড়াইতে অবগুণ্ঠনবতী যুবতীগণ, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী রমণীগণ, লোহিত বস্ত্র পরিহিত দাসদাসীগণ তাঁহাদের সঙ্গ গ্রহণ করিল। বাহিরের উঠান পার হইয়াই জীবনের মা অন্তঃপুরের দালানে আসিয়া পড়িলেন। দালানের এক কোণে দুইখানি ইষ্টকের এক চুলায় একটি ক্ষুদ্র ভাণ্ড চড়াইয়া এক রমণী চুলাগ্নিতে ফুঁ দিতেছিলেন। জীবনের মা সেইখানে দাঁড়াইয়া স্নেহকে বলিলেন, "চাওত মা, ঐ দিকে চাও"; সে তাহার অবগুণ্ঠন ঐ দিকে ফিরাইল—তবে তাহার মধ্যে হইতে সে কিছু দেখিতে পাইল কি না জানি না—কিন্তু অন্য সকলে দেখিলেন হাঁড়ির দুধ উথলিয়া উঠিল না। জীবনের মার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, আর সকলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাওয়া চাওয়ি করিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে কাণাকাণি করিল—"মেয়েটা অপয়া"!

কর্ত্রী ঠাকুরাণী এই সময় অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—সর্ব্বনাশ! দুধ উথলায় নাই! তিনি চুপি চুপি কথা কহিবার লোক নহেন, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "ও মেজ বৌ—এ কেমন মেয়ে তুই মোহনকে দিলি? দুধ যে ওৎলায় না?"

এ দিকে রমণীর অবিশ্রান্ত প্রাণপণ ফুঁকে সহসা দুধ উথলিয়া উঠিল—সকলে আনন্দ প্রকাশ করিল, জীবনের মা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন বলিলেন—"দিদি হয়েছে, হয়েছে, খুব উৎলেছে, ঐ দেখ।" বলিয়া সেখান হইতে দালানের

মধ্যস্থলে আসিয়া কলাগাছের কাছে পিঁড়ির উপর কন্যাকে দাঁড় করাইয়া দিলেন। বর পাশের পিঁড়িতে আসিয়া দাঁড়াইল; কলাগাছের নিকট একটি দধিপাত্রে খানিকক্ষণ হইতে একটি মাগুর মাছ ধড়ফড় করিতেছিল—বর কন্যা পিঁড়িতে দাঁড়াইতেই তাঁহাদের বস্ত্র দধিসিক্ত হইয়া উঠিল, সুলক্ষণ দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে একজন রমণী সমৎস্য দধিপাত্র স্থানান্তরিত করিলেন। এইবার কন্যার সিন্দুর পরিধান। কন্যার মাথার উপর একজন একটি ধানচুপড়ি ধরিয়া তাহার অবগুণ্ঠন কিয়ৎ পরিমাণে খুলিয়া দিলেন, বর তাঁহার অঙ্গুরীয়ক সিন্দুর রঞ্জিত করিয়া তদ্দারা কন্যার সীমন্ত রঞ্জিত করিলেন। তাহার পর বরণ আরম্ভ হইল। এ সমস্ত ক্ষণই হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, বাদ্যধ্বনি এবং চীৎকারধ্বনি সমান মাত্রায় চলিতেছিল। বরণ হইয়া গেলে বরকন্যা দ্বিতলে আনীত হইয়া যৌতুক গৃহে উপবিষ্ট হইলেন। যুবতীগণ তাঁহাদিগকে মঙ্গল ভাঁড় খেলাইতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঠাট্টা করিতেও ত্রুটি করিলেন না। এইরূপে সমস্ত স্ত্রীআচার-পর্ব্ব শেষ হইলে পর শ্বশুর মহাশয়কে পুত্রবধূর মুখ-দর্শনের জন্য অন্তঃপুরে তলব পড়িল। তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী যৌতুক হস্তে বর কন্যার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, দেবর যৌতুক করিয়া গেলে তিনি যৌতুক করিবেন। কৃষ্ণ বাবু গৃহে আসিবামাত্র জ্ঞানের মা কন্যার ঘোমটা তাহার মাথার উপর উঠাইয়া ধরিয়া ঠাকুর পোকে বলিলেন—"দেখ, ঠাকুর পো, বউ পছন্দ হয়?"

মুখ দেখাইবার সময় কন্যার চোখ বুজিতে হয় ইহা কে

না জানেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্নেহলতা তাহা জানিত না। ইহার প্রধান কারণ, স্নেহ জ্ঞান হওয়া অবধি কখনও কোন বিবাহ দেখে নাই—গৃহিণী তাহাকে কোন নিমন্ত্রণে লইয়া যাইতে ভাল বাসিতেন না। শ্বশুরগৃহে আসিবার সময়ও এ কথা তাহাকে কেহ শিখাইয়া দেয় নাই। ইহা এতই জানা কথা, স্নেহলতা ইহা যে জানে না ইহা সম্ভবতঃ কাহারো মনেই আসে নাই। সুতরাং জীবনের মা যখন তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিলেন, সে চোখ না বুজিয়া ধীরে ধীরে শ্বশুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। এই অপরিচিত রাজ্যে একটি করুণ মুখ, একটি স্নেহদৃষ্টি দেখিবার জন্য সে আকুল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শ্বশুরের মুখ তাহার নেত্রপথে বিম্বিত হইতে না হইতে শাশুড়ী তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"ওমা, এমন নির্লজ্জ মেয়ে ত দেখিনি, শ্বশুরের দিকে চায় দেখ!" স্নেহের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—তাহার অশ্রুপূর্ণ নেত্র তখনি নিম্নে পতিত হইল। জীবনের মা আস্তে আস্তে তাহাকে বলিলেন "বৌমা, চোখ বোজ।" সে চোখ বুজিল, কিন্তু তাহার মুদিত চক্ষু দিয়া জলধারা বাহিয়া পড়িল।

শ্বশুর যৌতুক দিয়া চলিয়া গেলে, প্রথমে মান্যের সম্পর্কীয়গণ—পরে ঠাট্টার সম্পর্কীয়গণ—শেষে অসম্পর্কীয় নিমন্ত্রিতেরা বর কন্যাকে যৌতুক প্রদান করিলেন। যৌতুক শেষ হইলে বর বাহিরে চলিয়া গেলেন—এইবার রমণীগণ নববধূর রূপ ও অলঙ্কারের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রসঙ্গে নানা কথা চলিতে লাগিল, গোড়াতেই বৌয়ের চুল বাঁধাটা

সকলে "ধ্যাঁচ" করিয়া দিলেন। গৃহিণী এই প্রথমবার স্নেহের চুল বাঁধিয়া দিয়াছেন—আঁট করিতে কসুর করেন নাই, কিন্তু অপসন্দ সেজন্য নহে, কলিকাটা তেমন ভাল হয় নাই—আর সোনার ফুলের বদলে খোঁপায় রূপার কাঁটা দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পর, বৌয়ের রংটা এক জনের বড় ফ্যাকাশে বলিয়া মনে হইল, অন্যজন বৌয়ের হাতটা হাতে লইয়া বলিলেন—"নরম আছে—তবে আঙ্গুলগুলো একটু লম্বা; দেখি পা কেমন ?" তিনি স্নেহের পা টানিয়া লইয়া তাহার পায়ের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন—অপর রমণী বলিলেন—"বৌ, চাওত একবার উপর দিকে!" বধূ লজ্জিত ভাবে নীচের দিকেই চাহিয়া রহিল,—রমণী রুক্ষ স্বরে বলিলেন—"ওমা বল্লে কথা শোনে না কেন গা—চাও না উপর দিকে ?" নববধূ উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; আর একজন বলিল—"আমার দিকে চাও দেখি!"

'চাওনি' দেখিয়া সে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"হাঁ চাওনি ভাল—মেয়ে ধীর।"

বৌয়ের রূপের পরীক্ষা এইখানেই সাঙ্গ হইতেছিল—কিন্তু আর একজন এই সময় বৌয়ের হাত ধরিয়া দাঁড় করাইয়া বলিলেন—"শরীরের গড়ন পিটন কেমন একবার দেখি? বড় রোগা, মেয়ে এত রোগা ভাল দেখায় না"—এ কথায় একবাক্যে সকলেই সায় দিলেন—তখন আবার স্নেহ বসিতে অনুরুদ্ধ হইল। এইরূপে রূপের পরীক্ষা শেষ করিয়া তখন সকলে তাহার গহনার দিকে মনোনিবেশ

করিলেন। কেহ তাহার হাতটা ধরিয়া বলিলেন—"চার গাছা চুড়ি আর বালা, এ কি না দিলেই নয় ?"

কোন যুবতী স্নেহের ঘোমটা খুলিয়া কণ্ঠের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন—এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিয়া নিন্দা করাও তিনি প্রয়োজন মনে করিলেন না। এক গাছি মাত্র চিক বৌয়ের গলায়, একি আবার গহনা গা !

ঘরে এইরূপ চলিতেছে এমন সময় শাশুড়ী ঠাকুরাণী আগমন করিলেন, তিনি এতক্ষণ অন্যদিকে কাজে কর্ম্মে গিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন—"কই কি গহনা দিয়েছে দেখি ?" দেখিয়া বলিলেন—"কি পোড়ার গহনাই দিয়েছে ? ও ক'খানাই বা দেওয়া যে কেন তাত জানিনে'—জীবনের মা এই সম্বন্ধের গোড়া—সকলের তিরস্কার-দৃষ্টি এক সঙ্গে তাঁহার দিকে পড়িল।

জীবনের মা বলিলেন, "ঠাকুরপো যে গহনার টাকা সব ধরে নিয়েছেন। তবু তারা যে এই ক'খানাও দিয়েছে তাদের ভাল বলতে হয়।"

কর্ত্রী ঠাকুরাণী রাগিয়া বলিলেন, "বটে—ঠাকুরপোকে জগৎ ডাক্তার ধন ঢেলে দিয়েছে নাকি ! এ কখানাও না হয় নাই দিত,—তার জন্য এত কথা !"

এ বিবাহে জীবনের মার একরূপ যাচিয়া আসা। দেবর নিমন্ত্রণ করেন নাই – কর্ত্রী ঠাকরুণ দাসীর মুখে একটা কথার কথা রকমে আসিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু মোহনের বিবাহ—বিশেষ তিনিই এ বিবাহের ঘটক, তাই এই অনি-মন্ত্রণ সত্ত্বেও বাসীবিবাহের দিন যৌতুক দিতে আসিয়া-

ছিলেন। এ সময় যদি তিনি কথা কন ত ঝগড়া হয়, তাহাতে তাঁহার ইচ্ছা নাই; তাই তিনি চুপ করিয়া গেলেন। আর একজন বলিল, "তা পরের মেয়েকে এই দিয়েছে এই ঢের"! মোহনের পিসি বলিলেন—"তা পরের মেয়ে মনে করে ত আমরা দিইনি—মোহনের কি আর কনে জুটত না!"

নবাগত বালিকা-বধূর মনের ভাবের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া সকলে তাহার সম্বন্ধে তাহার সাক্ষাতেই—এইরূপ নানা কথা কহিতে লাগিলেন। তাহার প্রাণ তখন কি করিয়া উঠিতেছিল ভগবানই জানেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্নেহকে জীবনের মা জল খাওয়াইতে লইয়া গেলেন; খাওয়া তাহার যত হইল তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। আহারের নামরক্ষার পর আবার পূর্ব্বোক্ত গৃহে সে আসিয়া বসিল। নিমন্ত্রিতাগণও এই সময় জলযোগ করিয়া অনেকে বাড়ী গেলেন, অনেকে কাপড় কাচিতে গেলেন, ইহাদের এই বিবাহ উপলক্ষে আপাততঃ এইখানেই স্থিতি। জীবনের মাও বধূর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন; বলিলেন,—"মা, তবে আমি আসি।"

এই অপরিচিত কঠোর রাজ্যের মধ্যে তিনিই তাহার একমাত্র স্নেহভাষিণী পরিচিতা আত্মীয়া! সে তাঁহার হাত ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে করুণ-কণ্ঠে বলিল—"মাসি, আমি কবে বাড়ী যাব? আমাকে নিয়ে চল!"—তিনি তাহার অশ্রু মুছাইয়া বলিলেন—"মাসি না মা—এখন আমি তোমার জ্যেঠাই! আর যাবার কথা কি এখন বলতে আছে?

এখন ফুলশয্যা হবে, বৌভাত হবে—তার পর জোড়ে যাবে—এখন কি যাবার কথা বলে ! আমি তোমার দাসীকে এই খানে ডেকে দিয়ে যাই, সে কাপড় কেচে এল বলে !"

এতক্ষণ এখানে কেহ ছিল না, এই সময় কর্ত্রী ঠাকুরাণী কাপড় কাচিয়া ভিজা গামছায় এই ঘরের বারান্দার নিকট দিয়া হরিনামের মালা আনিতে নিজের ঘরে যাইতেছিলেন, একবার অমনি উঁকি মারিয়া বলিলেন—"বৌ বলে কি, মেজ বৌ ?" জীবনের মা বলিলেন, "কিছু না—ছেলেমানুষ বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে, তাই কাঁদছে।" শাশুড়ী বলিলেন—"অত বড় মেয়ের আবার মন কেমন করা কি গা ! আর ঘরে কি না ১০টা বাবা কাঁদছে"। সংক্ষেপে এইরূপ মমতা প্রকাশ করিয়া কর্ত্রী নিজগৃহে গমন করিলেন। স্নেহ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, জীবনের মারও চক্ষু দিয়া জল পড়িল, তাঁহার মনে হইল—"স্নেহ যদি তাঁহার বৌ হইত ত বুকে করিয়া রাখিতেন, জীবন কেন বিবাহ করিল না।—জীবনের মা তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া বলিলেন, "কেঁদ না মা—ও মাগীর ঐ রকম স্বভাব, ওতে কিছু মনে করো না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম দিন শ্বশুরালয়ে আসিয়া স্নেহলতা ত এইরূপ আনন্দ উপভোগ করিল। অধিকাংশ বঙ্গবালাদিগেরই নববধূ জীবনের প্রথম স্মৃতি অল্প বিস্তর পরিমাণে এইরূপ! প্রিয়-বিচ্ছিন্ন কোমল কাতর হৃদয়গুলি যখন অপরিচিতের মধ্যে আসিয়া একটি স্নেহ দৃষ্টি, একটি সাদর সান্ত্বনা বাক্যের জন্য লালায়িত—তখন সাধারণতঃ তীব্র সমালোচনার দংশনই তাহাদের সাদরোপহার—তাহাদের সম্মান অভ্যর্থনা।

একখানি নীরব কচিপ্রাণের মধ্যে অন্য মনুষ্যের ন্যায় অনুভব-শক্তি আছে ইহা বোধ হয় সমালোচনাকারিণীগণের তখন মনেই আসে না, প্রাণহীন পাষাণখণ্ডের সম্মুখে যেন তাঁহারা আপনাদের অকুণ্ঠিত, কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন।

আজ যাঁহারা এইরূপ নির্দ্দয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহাদের সময়ে তাঁহারাও ইহার জ্বালা ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার স্মরণে অন্যের বেলা ত তাঁহাদের দয়ার্দ্র হইতে দেখি না। যাহা আপনারা ভোগ করিয়াছেন—যাহা সর্ব্বদাই দশ জনকে ভোগ করিতে দেখিতেছেন—তাহা তাঁহাদের নিকট ক্রমে দস্তুর কর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়; ইহা নিষ্ঠুরতা বলিয়া হয়ত তাঁদের আর মনেই হয় না।

যাহা হউক বাসীবিবাহের দিন রাত ত একরকম করিয়া কাটিয়া গেল, পরদিন ফুলশয্যা। দুই প্রহরের পর হইতে

নিমন্ত্রিতাগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন। কুঞ্জবাবুর নিতান্ত আত্ম-সম্পর্কীয়া যাঁহারা তাঁহারাই মাত্র কাল বাসি বিবাহের দিনে মজলিস জমাইয়াছিলেন। কিন্তু আজ কুঞ্জলাল বাবুর এবং তাঁহার ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরাণীর আত্মীয়া সম্পর্কে তিন কুলে যিনি যেথানে আছেন—(জীবনের মা ছাড়া) সকলেই নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন, অনেকেই উপস্থিত হইলেন। জীবনের মা আজ আর আসিলেন না।

আর একবার নূতন করিয়া গত দিনের মত বৌয়ের রূপের চর্চ্চা এবং দান সামগ্রীর সমালোচনা শেষ করিয়া প্রৌঢ়াগণ একত্র হইয়া এক ঘরে গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। এক যুবতীর কাকা কন্যাকে আগা গোড়া জড়োয়া গহনায় ঢাকিয়া এবং 'সাসোঁজ' রৌপ্যদান দিয়া কিরূপ ঘোরঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছেন, একজনের কাকা বড় মানুষের মেয়ে বৌ করিয়া কিরূপ ঠকিয়াছেন, এক জনের ননদের খুড়তত ভাই টাকার লোভে কিরূপ কাল মেয়ে বৌ করিয়াছে— অধিকাংশ গল্পই এইরূপ।

এদিকে বিবাহিতা অবিবাহিতা বালিকাগণ, অল্পবয়স্কা যুবতীগণ অন্য ঘরে বৌকে ঘেরিয়া বসিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় গল্প স্বল্প আরম্ভ করিলেন।

এরূপ স্থলে বাক্যালাপ নিতান্তই এক পক্ষীয়। বধূ চুপ করিয়া থাকেন; অন্যেরা তাহাকে প্রশ্ন করে,—কিন্তু উত্তরের প্রত্যাশা না রাখিয়াই আপনারা গল্প করিয়া যায়। অধিকাংশই স্বামীসম্বন্ধীয় গল্প। বিবাহের রাত্রে, ফুলশয্যার রাত্রে, কার স্বামী কিরূপে কাহাকে কথা কহাইতে চেষ্টা

করিয়াছিলেন, কোন রমণীর লজ্জা ভাঙ্গিতে কতদিন লাগিয়াছিল, কাহার স্বামী কাহাকে কত ভালবাসে, কোন দিন কি ভাবে সে ভালবাসা প্রকাশ পাইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আজও যুবতীগণ এই সকল গল্প করিতে করিতে স্নেহলতাকে সাজাইতে লাগিলেন।

তাহার চুল বাঁধিয়া দিলেন, তাহার পায়ে আলতা, সিঁথিতে সিন্দুর, কপালে চন্দন, চোখে কাজল পরাইলেন। এইরূপ সাজসজ্জায় গল্প স্বল্পে তাঁহাদের সময় সুখে কাটিতে লাগিল, কেবল মাঝে মাঝে কখন ফুল-শয্যা আসিবে বলিয়া ইহার মধ্যেও তাঁহারা ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ফুলের গহনা ও শয্যা বস্ত্র সেখান হইতে আসিলে তবে তাঁহারা নববধূর সাজ সম্পূর্ণ করিতে পারেন।

সন্ধ্যার বাতি জ্বলিবার কিছু পরেই কর্ত্রী ঠাকুরাণী ডাকিলেন—"আয়, সব! তত্ত্ব আস্‌ছে—তোরা দেখে শুনে উঠিয়ে রাখ—" স্নেহলতাকে একাকী রাখিয়া সকলে উৎসুক হইয়া বড় দালানের দিকে ছুটিল; রঙ্গিন বস্ত্রমণ্ডিত থাল হস্তে, রঙ্গিন বস্ত্র পরিহিত দাসদাসীগণ পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় একে একে দালানে আসিয়া থালা নামাইতে লাগিল। সকলে আগ্রহ সহকারে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন! অনেকেই 'তত্ত্বের' প্রশংসা আরম্ভ করিলেন, এক জন বরকন্যার শয্যা বস্ত্র হাতে লইয়া অন্য সকলকে দেখাইতে লাগিলেন, সকলেই বলিলেন—"বেশ দিয়েছে, ডাক্তারের হাত দরাজ বটে!"

কিন্তু সংসারে এক এক দল লোক আছেন, যাঁহাদের

চোখে ভাল কিছুই পড়ে না, যে কোন জিনিস হউক তাহার মধ্যে ভালটুকুর পরিবর্ত্তে যে তিল পরিমাণ খুঁৎ আছে, তাহাই তাঁহারা দেখিতে পান। মোহনের জ্যেঠাইমা এই প্রকৃতির লোক; জগৎ বাবু কিংখাপ দিলেও জ্যেঠাইমা সর্ব্বান্তঃকরণে খুসী হইতেন না—কোন না কোন খুঁৎ বাহির করিতেন। সুতরাং তিনি বস্ত্রের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া সুদীর্ঘ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"মেয়ের বেনারসী, ছেলের ঢাকাই, তা এমন কাপড় ঢের দেখেছি—ওলো বৌরা,—ক'ণের ফুলচন্নন কাপড় নিয়ে যা।"

কনের বাড়ীর দাসী চাকরগণ তাঁহার এই নাসিকা-কুঞ্চিত বাক্যে রাগে গস্‌গস্‌ করিয়া উঠিল—কিন্তু কথা কহিতে সাহস করিল না। ক্রমে দালান পরিষ্কার হইল, জিনিসপত্র ঘরে উঠিল, বেহাই-বাড়ীর চাকর দাসী বিদায় হইল, ফুলসজ্জিত-বরকন্যা ঝাড়লণ্ঠন প্রজ্জ্বলিত ফুলশয্যাগৃহে আনীত হইয়া মসলন্দের উপর বসিলেন, তখনও নৃত্যকারিণীগণ আসিয়া পৌঁছে নাই; যুবতীগণ বরকন্যাকে মঙ্গল ভাঁড় খেলাইতে লাগিলেন, চারিদিক হইতে হুলুধ্বনি আতর গোলাপ ফুল বৃষ্টি হইতে লাগিল, ক্রমে ঠাট্টা বৃষ্টিও আরম্ভ হইল। বিবাহ উৎসবের সেই চিরপ্রচলিত চির পুরাতন ঠাট্টা—প্রত্যেক রমণীরই নিজের অতীত জীবনের সুখস্মৃতি সুখস্বপ্ন যাহাতে বিজড়িত বলিয়া চির নবীন সরস উপহাসরূপে যাহা উপভোগ্য,—তাহার বর্ষণে চারি দিক আনন্দময় হইয়া উঠিল। বরের দিদিমা-সম্পর্কীয় রমণী ঠাট্টার সূত্রপাত করিলেন। তিনি কন্যার মুখের

ঘোমটা খুলিয়া মোহনকে বলিলেন—"দেখরে! ভেঁড়ো হতে পারবি ত?" তখন জগদ্ধাত্রী ঠাকরুণ—পাড়ার সর্ব্বসাধারণের পিসমা, আর ঠাট্টার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না—মোহনের হাতে সন্দেশ দিয়া বলিলেন—"বাছা, কনেকে খাইয়ে দেও দেখি"। মোহন ইহাতে কোন আপত্তির কারণ না দেখিয়া তাঁহার অভিমত কার্য্য করিবামাত্র অমনি চারিদিকে হাসির ধুম পড়িয়া গেল। অতঃপর মোহনের ভ্রাতৃজায়া সম্পর্কীয় একজন যুবতী পশ্চাৎ হইতে তাহার কাণ মলিয়া সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—"কেমন বর, কথা কয় না কেন? একটা গান কর!" মোহন বলিলেন—"আমি গান জানি না।" তিনি বলিলেন, "বৌকে কোলে করতে জানত? কোলে কর।" চারিদিক হইতে অনুরোধ উঠিল "বৌকে কোলে কর—কোলে করতে হয়।" মোহন তাহাতে নীরবে আপত্তি প্রকাশ করায় তাহার কর্ণ নাসিকা রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিল; সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল, এদিকে একজন রমণী স্নেহকে জোর করিয়া উঠাইয়া তাহার কোলে বসাইয়া দিলেন। অত্যন্ত হাসির গড়রা উঠিল; বেচারা বর বিষম অপ্রস্তুত হইয়া স্নেহকে নামাইয়া দিবে কিম্বা কোলে করিয়া রাখিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। এমন "জাক্‌টা পোজিসনে" কিশোরীও কখনো পড়ে নাই। এমন সময় ঘুঙ্গুরের শব্দ হইল—সকলে আহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "ঐ নাচওয়ালী আসছে!" এই আনন্দ উৎসবে নৃত্যকারিণীগণ নহিলে তাঁহাদের আনন্দ পূর্ণ হইবার নহে।

সকলের ব্যস্ততার মধ্যে মোহন স্নেহকে নামাইয়া দিলেন। নৃত্যকারিণীগণ গৃহে প্রবেশ করিল, মন্দিরার ধ্বনি, বাঁয়া তবলার চাঁটি, ঘুঙ্ঘুরের রুনুঝুনু আরম্ভ হইল! বর কন্যার সম্মুখে নাচিতে নাচিতে তাহারা গান ধরিল—

"নাগর, মনের মত মিলিলো ভালো,
'রূপে জুড়ায় আঁখি, ভুবন আলো!"

দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ফুলশয্যাগৃহে নৃত্যগীত চলিল, তাহার পর বর কন্যাকে নিদ্রাতুর দেখিয়া নৃত্যকারিণীগণ অন্য গৃহে নীত হইল। এখন যাঁহার ইচ্ছা তিনি জলযোগ করিয়া গৃহে যাইবেন, যাঁহার ইচ্ছা তিনি আরো নৃত্যগীত ভোগ করিবেন। নৃত্যকারিণীগণ গৃহান্তরে গমন করিলে বর কন্যার শয়ন উদ্যোগ আরম্ভ হইল। একটি ঝাড় মাত্র প্রজ্বলিত রাখিয়া অবশিষ্ট দীপ নির্ব্বাণান্তে রমণীগণ আপনারা আতর গোলাপে ফুলমালো ভূষিত হইলেন, এবং বর কন্যাকেও ভূষিত করিলেন। তাহার পর হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি মঙ্গলাচরণের মধ্যে তিনজন যুবতী ফুলসজ্জিত পালঙ্কের মশারি খুলিয়া ধরিলেন। বর কন্যা পালঙ্কে উঠিলে এক জন যুবতী নিজের ইচ্ছামতরূপে স্নেহকে শয্যাশায়িত করিলেন—অন্য যুবতীগণ তাহাদের গাত্রে ফুল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে ফুলশয্যা শেষ করিয়া উপহাসবাক্য বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহারা গৃহের বাহিরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

সকলে চলিয়া গেল, গৃহ নিস্তব্ধ হইল, স্নেহের এতক্ষণকার রুদ্ধ অশ্রু আর বাঁধ মানিল না, সে বিছানায় শুইয়া

কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, মোহন তাহার গায়ে হাত দিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাঁদিতেছ কেন?" শ্বশুরগৃহে আসিয়া স্নেহলতা যেরূপ অভ্যর্থনা পাইয়াছে—সে জানিত সেইরূপ অভ্যর্থনাই চিরদিন তাহার এ গৃহে প্রাপ্য, সহসা এই করুণস্বর তাহার অন্তস্তলে প্রবেশ করিল, সে সচকিতে ঘোমটার মধ্যে হইতে মোহনের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। যুবতীগণ তাহাকে মোহনের দিকেই ফিরাইয়া শোয়াইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঘোমটার ভিতর দিয়া মোহনকে সে ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না, স্নেহকে মুখ উঠাইতে দেখিয়া সযত্নে মোহন তাহার ঘোমটা ঈষৎ খুলিয়া দিলেন, সে ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিল, দেখিল সে মুখ সত্যই করুণ স্নেহের ভাবে পূর্ণ! তাহার হৃদয়ে আশ্বাস জন্মিল, তাই তাহার রুদ্ধ অশ্রু আর একবার উথলিয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি বাড়ী যাব।" স্বামী বলিলেন—"আমি তোমাকে যত্ন করব—আমার কাছে থাকবে না?" স্নেহ বলিল, "না আমি বাড়ী যাব।"

মোহন বলিলেন—"আচ্ছা, তোমাকে বাড়ীই পাঠিয়ে দিতে বলব এখন।" সে বলিল "কবে?" স্বামী বলিলেন—"বৌভাত হয়ে যাক্, তার পরে?" বলিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিলেন এবং তাহাকে ঘর্ম্মাক্ত দেখিয়া শয্যাস্থিত ফুলের পাখা লইয়া আস্তে আস্তে বাতাস দিতে লাগিলেন। হঠাৎ খাটের ওপাশ হইতে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া সম্পর্কীয়া একজন রমণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "সব শুনেছি ঠাকুরপো এর মধ্যে এত ভালবাসা!

ফাল্গুন মাসে আবার পাখার বাতাস! ওমা যাব কোথায়!" আমাদের কিন্তু মনে এমনটা হয়, তাঁহার বেশী দূর যাইবার আবশ্যক ছিল না, একবার মাত্র যদি কেবল তিনি স্নেহলতার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিতেন তাহা হইলেই বুঝিতেন যে, তাঁহারা পাঁচ জন শক্তিরূপায় মিলিয়া স্নেহলতার চতুস্পার্শ্বস্থ শ্বসনীয় বায়ুমণ্ডলে যেরূপ আগুণের হল্কা ছুটাইয়াছেন তাহাতে শুদ্ধ পাখার বাতাসে কেন বরফজল সিঞ্চনেও সে উত্তাপ নিবৃত্তি হয় না।

দেবরঠাকুর ভ্রাতৃজায়ার এই ব্যঙ্গে নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। স্নেহলতা ভয়-কাতর হইয়া পড়িল; এই ভয় যে, যদি সে স্বামীর সহিত কথা কহিয়া কোন অপরাধ করিয়া থাকে,—আরো ভয় যদি এই অপরাধে তাহার আর বাড়ী যাওয়া না হয়।

ভ্রাতৃজায়া ত ঠাট্টা করিয়া চলিয়া গেলেন। সে রাত্রে বরকন্যার কথাবার্ত্তাও ঐখানে সমাপ্ত হইল। আবার কে আড়ি পাতিয়া শুনিবে—বর সাবধান হইয়া তবু আরো দুই একটা কথা কহিলেন,—কিন্তু স্নেহলতা আর সে কথার প্রত্যুত্তর করিতে সাহস করিল না,—তাহার পর দুইজনেই ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন সকাল না হইতে হইতে বর বাহিরে গেলেন। যে সকল অল্পবয়স্কা বিবাহিতা বালিকাগণ বিবাহ উপলক্ষে এই বাড়ীতে আসিয়া আছে—তাহাদের দ্বারা কন্যার পালঙ্ক অধিকৃত হইল। রাত্রে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহার খবর জানিতে সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিল এবং তাহাদের জিজ্ঞাসায় স্নেহকে নিরুত্তর দেখিয়া কেহ বা বিরক্ত হইয়া

তাহাকে চ্যাঁটা বলিয়া চলিয়া গেল, কেহ বা অন্য কে কোন লক্ষ্মীমেয়ে ফুলশয্যার দিনের আমূলগল্প তাহাদের নিকট করিয়াছিল, তাহার প্রশংসা করিতে করিতে আজিকার নৈরাশ্য দুঃখ নিবৃত্ত করিল। যাহা হউক স্নেহলতা মৌনী সত্ত্বেও তাহাদের রাত্রের কথোপকথন প্রকাশ হইল, ক্রমে জ্যেঠাইমার কর্ণেও তাহা উঠিল—তিনি দুই হাত গালে দিয়া বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—"বাবারে এ কি মেয়ে। এরি মধ্যে এত কথা! ছেলেকে যে দুদিনে যাদু করবে!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অবশেষে স্নেহলতার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। পাকস্পর্শ হইয়া গেলে বিবাহের অষ্টম দিবসে নবদম্পতি জগৎ বাবুর বাড়ী শুভাগমন করিলেন। এই পুরাতন, পরিচিত আত্মীয় ভূমিতে আর একবার পদার্পণ করিয়া স্নেহলতার হৃদয় পরিপূর্ণ আনন্দে মগ্ন হইল, বায়ুহীন অন্ধকার বদ্ধ-কোটর হইতে নির্গত হইয়া সহসা যেন সে প্রসারিত, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বসন্তপূর্ণ মুক্ত কাননে দাঁড়াইয়া রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পাল্কী উঠানে নামিবার আগেই চারু টগর দাস দাসীগণ সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, জগৎ বাবু আসিতে পারেন নাই, কেননা তিনি মোহনকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য বাহিরে ছিলেন। স্নেহলতা যখন তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল—তখন আহ্লাদে তাহার মুখে আর কথা ফুটিল না, অতিরিক্ত সুখে লজ্জাবতী

লতার মত সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার অধর পুটের হাসিরেখা, নয়নের আনন্দ দৃষ্টি পুলকে ম্লান হইয়া পড়িল। দাসীরা বলিল—"ওমা, দিদিমণির ছুদিনে লজ্জা হয়েছে দেখ, দিদিমণি প্রণাম হই! আমাদের ভুলে যাওনি ত?" চারু বলিল—"স্নেহ, দাঁড়ালি কেন, বাগানে চল"—

টগর বলিল—"না, মায়ের কাচে দিদি যাবে"—

টগর তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল, চারু অনুবর্ত্তী হইল। তাহারা উপরের বারান্দায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে জগৎ বাবুও তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সেদিন সমস্ত বেলাটা স্নেহলতার একটা স্বপ্নের মত কাটিয়া গেল, চারু টগরের সহিত হাসিয়া খেলিয়া, জগৎ বাবুর সহিত গল্প করিয়া, বাগানে ফুল তুলিয়া, ছাতে ছুটাছুটি করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত সময়টা ফুরাইয়া গেল। সন্ধ্যা বেলা যখন শুনিল—পাল্কী প্রস্তুত, এখনি যাইতে হইবে—তখন তাহার মনে হইল—"সে কি? এইমাত্র ত এখানে আসিয়াছি!" স্নেহলতা কাঁদিয়া গৃহিনীকে বলিল—"মামীমা, আজ যাব না।"

টগরও তাহার হইয়া মাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। গৃহিনী কোমলভাবে বলিলেন—"বাছা, আজ ধূলাপায়ে কি থাকতে আছে, এর পর তখন একদিন আনব"—

জগৎ বাবু আসিতে স্নেহলতা তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল। জগৎ বাবু বলিলেন—"আজ না পাঠালে কি হয়? আজ যা, হপ্তা খানেকের মধ্যেই আবার তোকে আনতে পাঠাব।"

স্নেহলতা আর কি বলিবে! বিদায়ের অশ্রু-জলের মধ্যে

দিবসের সমস্ত সুখ ধৌত করিয়া অন্ধকার ক্রোড়ে লইয়া সে আবার পাল্কীর মধ্যে উঠিল।

সাত দিন পরে জগৎ বাবু লইতে পাঠাইবেন—কিন্তু এ সাত দিন তাহার কি করিয়া কাটে? বাড়ীতে একটি সমবয়স্কা বালিকা নাই, বই হাতে করিবারর যো নাই, (একদিন তাহার হাতে বই দেখিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী সর্ব্বনাশ বাধাইয়াছিলেন) নববধূ—সংসারের কোন কাজ কর্ম্মের ভার হাতে নাই, ছাতে কি বাগানে বেড়াইবার যো নাই, সারাদিন এক গৃহে বসিয়া থাক, ইচ্ছা হইলে শুইতেও পার কিম্বা ঘরের মধ্যে কি বারান্দায় বেড়াইতেও পার, এই টুকু মাত্র স্বাধীনতা অবশ্য আছে।

জগৎ বাবু তাহার সঙ্গে যে দাসী দিয়াছিলেন, ফুলশয্যার দিনেই জ্যেঠাইমা তাঁহাকে ফেরৎ পাঠাইয়াছেন। "কেন এখানে কি দাসী নাই—যে বৌযের বাড়ী থেকে দাসী এসে থাকবে?" সে কাছে থাকিলেও স্নেহলতা এখন বর্ত্তিয়া যাইত। এখানকার দাসী আবশ্যক মত মাঝে মাঝে স্নেহলতার কাছে এক একবার আসে, স্নানাহারেব সময় তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যায়—প্রয়োজন মত বস্ত্রাদি প্রদান করে, এবং সময় সময় কাছে বসিয়া ছদণ্ড গল্পস্বল্পও করে! স্নেহলতা তাহার সহিত কথা কহেনা—কেননা সে নববধূ, কিন্তু এই নির্জ্জন বন্ধুহীন কাবাগারের মধ্যে উহার কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেও সে কিছু ভাল থাকে।

মোহন যদি স্নেহের কাছে এ সময় মাঝে মাঝে আসিতে পারিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই কারাগারও স্নেহের

সহনীয় বোধ হইত। বালক-স্বামীর বন্ধুত্ব, স্নেহ, মমতাই বালিকা-স্ত্রীগণের এ সময়ের এক মাত্র সান্ত্বনা। এই সান্ত্বনা-বলেই তাহারা ক্রমে পরকে আপনার করিতে শিখে, নিজের পিতা মাতা গৃহ ভুলিয়া পরের গৃহ অসঙ্কোচে আপন করিয়া লয়। কিন্তু মোহন শিবপুরে থাকে, আগে শনি রবিবারে সেখান হইতে বাড়ী আসিত, কিন্তু তাহার একটা পরীক্ষা সন্নিকট, সেই নিমিত্ত পিতা আপাততঃ তাহাকে বাড়ী আসিতে বারণ করিয়াছেন। তবুও লুকাইয়া ইহার মধ্যে একদিন সে বাড়ী আসিয়াছিল ভাবিয়াছিল রাত্রে আসিয়া ভোর না হইতে হইতে চলিয়া যাইবে, কেহ জানিতে পারিবে না। কিন্তু সে যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, তখনো জ্যোঠাইমা বারান্দায় বসিয়া হরিনাম করিতেছিলেন, সেই বারান্দা দিয়াই স্নেহলতার ঘরে যাইতে হয়, স্মুতরাং মোহন ধরা পড়িয়া বিস্তর লাঞ্ছনা সহ্য করিল, কেবল তাহাই নহে, সেই রাত্রেই তাহাকে স্কুলে ফিরিয়া যাইতে হইল।

শ্বশুর গৃহের এই সকল নানারূপ অধীনতা, কষ্টের মধ্যে দু একটি সুখভোগে স্নেহলতার অবারিত অধিকার আছে। সে কাঁদিতে পারে, আর পুতুল খেলিতে তাহাকে জ্যোঠাইমা বারণ করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় অধিকারটি পাইয়াও তাহার না পাইবার মধ্যে হইয়া পড়িয়াছিল। সময়ে সময়ে স্নেহ বাক্স হইতে পুতুলগুলি বাহির করিত, (দানে স্নেহ যত পুতুল পাইয়াছিল, তাহার ঘরে দাসীরা তাহা বাধিয়া দিয়াছিল।) বাহির করিয়া গৃহে সাজাইত, সাজাইয়া তাহাদের লইয়া খেলিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাতেও

তাহার কেমন মন লাগিত না। যখন জগৎ বাবুর বাড়ীতে ছিল, তখন কাজ কর্ম্ম লেখাপড়ার পর একটু অবসর পাইলে পুতুল খেলিয়া তাহার কত আনন্দ হইত, মাটির পুতুলকে সাজাইয়া তাহার সহিত কথা কহিয়া সে সজীব সখ্যতাভাব অনুভব করিত! এখন মাঝে মাঝে সে পুতুল হাতে করিয়া বসে, খেলিতে যায়, তাহাকে কাপড় পরাইতে আরম্ভ করে, কিন্তু শেষে কিছুই হইয়া ওঠে না; হাঁতের পুতুল হাতেই থাকে—সে কেবল বসিয়া বসিয়া আনমনে বাড়ীর কথা ভাবে। গৃহিনীর ভৎর্সনাও এখন তাহার সুখের বলিয়া মনে হয়, সে স্মৃতিতেও স্নেহলতা মাতার স্নেহ দেখিতে পায়। শ্বশুর গৃহের এই নির্জ্জন বাসের পরিবর্ত্তে চিরদিন সেই ভৎর্সনাও স্নেহ সহিতে প্রস্তুত!

যাহা হউক কোন প্রকারে স্নেহের এই দুঃখের সপ্তাহও কাটিয়া গেল, হারার মা একদিন আসিয়া হাজির হইল। আনন্দে স্নেহলতার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। কিন্তু দাসী স্নেহকে লইয়া যাইবার কথা উত্থাপন করিতেই জ্যাঠাইমা আপত্তি করিয়া বসিলেন—বলিলেন, “সামনে চোৎ মাস এখন পাঠালে বৌকে আর মাস খানেক তো আনতে পারব না। বড় মেয়ে এত ঘন ঘন বা যাওয়া কেন? এইত সেদিন জোড়ে গেল। নিজের ঘর দোর চিনে নিক।”

দাসী বলিল—“চিনবে বই কি! যখন বড় হবে—সোয়ামী চিনবে, তখন আমরা ডাকলেও আর যেতে চাবে না। তা ছেলেমানুষ আরো দু বছর যাক। এখন যে দিন রাত কেঁদে কেঁদে বাছা সারা হয়”।

যদিই বা স্নেহলতার যাওয়া হইত, এ কথার পর আর সে সম্ভাবনা রহিল না। কর্ত্রী বলিলেন—"কেন আমরা ত আর বেঁধে মারিনে যে এত কান্না ? আর মেয়ে মানুষের এতই বা কি সোহাগীপোনা ? যাওয়া হবে না—বলোগে বেহাইকে।"

স্নেহলতা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিল। দাসী যখন মুখ চুন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল তখন সে কাঁদিতেছে। হারাব মাও নিজের চোখের জল মুছিতে মুছিতে 'শ্বাশুড়ি-মাগী'র শ্রাদ্ধ কামনা করিতে লাগিল, আর নানা মতে স্নেহকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ বাপের বাড়ীর দাসীব সহিত বৌকে একত্র থাকিতে দেওয়া কর্ত্রীঠাকুরাণীর বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না, অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনিও এই গৃহে আসিযা দাঁড়াইলেন, এবং এত শীঘ্র মেয়েকে লইতে পাঠাইয়াছেন, এই অপরাধে বেহাই বেয়ানকে এমন দুদশ কথা শোনা-ইতে প্রবৃত্ত হইলেন, যে দাসী পলাইতে পথ পাইল না।

জগৎ বাবু নিজে পরদিন কুঞ্জ বাবুব সহিত দেখা কবিয়া স্নেহলতাকে বাড়ী লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে তিনি কোন আপত্তি প্রকাশ করিলেন না। কেবল বৌঠাকুরাণীব মতটা পাওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। জগৎ বাবু তাহা শুনিয়া নিজেই বেয়ান ঠাকরুণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও অনেক করিয়া বলিয়া কহিয়া তাঁহাব সম্মতিও আদায় কবিলেন ; এবং পাছে বিলম্বে আবার কোন নূতন বাধা ঘটে এই ভাবিয়া জগৎ বাবু সেই দিনই তাঁহার সঙ্গে স্নেহলতাকে বাড়ী লইয়া আসিলেন।

চৈত্র মাস ভোর স্নেহলতা জগৎ বাবুর বাড়ীতেই রহিল। বৈশাখ পড়িতেই তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুরবাড়ী হইতে পাল্কী ও লোকজন আসিয়া হাজির! স্নেহলতা গেল, সেইরূপ কাঁদিয়াই গেল; জগৎ বাবুর নিকট কথা লইয়া গেল, আবার শীঘ্র আনিতে পাঠাইবেন। কিন্তু এবার দিন দশ বার পরে হারার মা আবার যখন কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট আসিয়া স্নেহকে লইয়া যাইবার কথা পাড়িল—তিনি ত একেবারে আগুণ হইয়া উঠিলেন। "এই সমস্ত চোৎ মাস কাটিয়ে মাঝে দুদিনমাত্র এখানে এসেছে—এরি মধ্যে যাওয়া! মেয়ের যদি এতই সোহাগ ত বিয়ে দেবার দরকার কি ছিল? রোজ রোজ বৌ পাঠান আমাদের দস্তুর নয়, এতে বেয়াই যদি রাগ করেন তবে ঘরের ভাত দুটি যেন বেশী করে খান!"

হারার মা ত চলিয়া গেল, জগৎ বাবু সমস্ত শুনিয়া ভাবিলেন—দাসী না পাঠাইয়া নিজে গেলেই ভাল করিতেন। পরদিন নিজে বেয়ান ঠাকরুণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অনুনয় বিনয় আরম্ভ করিলেন। ডাক্তারের কেমন কথা—কর্ত্রী ঠাকুরাণী তাহা এড়াইতে পারেন না, অগত্যা তাঁহার কথায় সম্মতি দিতে হইল। বলিলেন "আচ্ছা কাল পাঠাব—কিন্তু আর যেন নিয়ে যাবার কথা মুখে এন না।"

এই সুসংবাদ লইয়া জগৎ বাবু স্নেহের সহিত দেখা করিতে গেলেন। পরদিন আর দাসী না পাঠাইয়া স্নেহকে আনিতে চারু ও টগরকে পাঠাইয়া দিলেন।

সে দিন স্নেহলতার স্ফর্ত্তি দেখে কে? তাহাদের সঙ্গে

কথা কহিতে কহিতে শ্বশুর-গৃহে থাকিয়াও সে ভুলিয়া গেল যে শ্বশুর-গৃহে আছে। তাহার মাথার ঘোমটা চারু খুলিয়া দিল,—সে তাহা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করায় টগর তাহার হাতটা ধরিয়া রাখিল—বড় হাসি জমিল। এইরূপ হাসি-খুসীর মধ্যে কোলঙ্গার কতকগুলি ছবির প্রতি চারুর নজর পড়িল,—সেখানে গিয়া সেগুলি হস্তগত করিয়া সে বলিল—"বেশ ছবি ত, কোথা পেলি?" টগরও স্নেহকে ফেলিয়া সেই দিকে ছুটিল, ছবিগুলি দেখিয়া বলিল—"জামাই বাবু বুঝি দিয়েছে?"

স্নেহ বলিল "হাঁ"—বলিয়াই অমনি তাহার মনে হইল—ভাল কাজ করে নাই, বলিতে লজ্জা করা উচিত ছিল। স্বামীর সহিত কথা কহিতে, স্বামীর কথা অন্য কাহাকেও বলিতে লজ্জা করিতে হয়—এসব স্নেহলতা এখন শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা ভাবিয়াই লজ্জায় স্নেহের মুখ লাল হইয়া উঠিল। টগর হাততালি দিয়া উঠিল—চারুও হাসিতে লাগিল, স্নেহলতাও হাসিতে লাগিল। এই আমোদের মধ্যে মাথায় কাপড় দিতে আর তাহাব মনে রহিল না। তাহাদের হাসির গড়রা শুনিয়া কর্ত্রীঠাকরুণ বারান্দা হইতে ঘরের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিলেন—বৌয়ের ভাই বোন আসিয়াছে। আস্তে আস্তে 'হুঁ' করিয়া চলিয়া গেলেন। চারু টগর একটু পরে তাঁহার কাছে আসিয়া যখন বলিল—"তাহারা স্নেহকে লইতে আসিয়াছে"—তখন তিনি বলিলেন, "এ বারবেলায় কি আজ বৌ পাঠান যায় গা?—

চারু বলিল—"কেন বাবাকে ত তুমি কাল কথা

দিয়েছ ?” জ্যেঠাইমা হরিনামের মালা ঠিক ঠিক করিয়া বলিলেন—“কাল আমার মনে ছিল না যে আজ কাল-মঙ্গল-বার, তা একদিনে ত আর যুগ ওলটাবে না, আর এক দিন না হয় তখন যাবে।”

চারু রাগিয়া গেল—বলিল—“আয় টগর আমরা যাই—আমাদের এ অপমান!” এক দিন জগৎ বাবুর মার খাইয়া সে যেমন অপমানিত জ্ঞান করিয়াছিল, আজও সেইরূপ অপমানিত জ্ঞানে সে মস্ত ফুলিয়া উঠিল। রাগে স্নেহের সঙ্গে আর একবার দেখা পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া, টগরের হাত ধরিয়া মস মস করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। গলির মোড়ে মোহনের সহিত দেখা হইল, তাহাদের গাড়ী দেখিয়া মোহন নিজের গাড়ী থামাইতে বলিল। চারুর নিকট সমস্ত শুনিয়া মোহন বিশেষ দুঃখিত হইয়া পড়িল—বলিল ‘চারু, জ্যেঠাই মা ত পাগল, কিছুই বোঝেন না, তাঁর কথায় রাগ করো না, আমি পরে পাঠাতে চেষ্টা করব।”

চারু তাহার কথায় কিছু উত্তর করিল না—কেবল ছোট্ট মুখখানা গোমসা করিয়া মস্ত লোকের চালে জোরে বলিল—“কোচমান্, ঘর চলো”।

কোচমান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। মোহন বিরক্তমনে বাহিরের ঘরে আসিয়া একটু বসিল। যখন দীপ জ্বলিল, সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা বাজিল, সে আস্তে আস্তে স্নেহের ঘরে চলিল—মোহন জানিত সে সময় জ্যেঠাইমা ঠাকুর ঘরে থাকিবেন। স্নেহ তখন বিছানায় শুইয়া কাঁদিতেছিল, মোহন তাহার কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কি হয়েছে?”

স্নেহের আজ লজ্জা করিবার কথা মনে নাই, সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি বাড়ী যাব—বাড়ী যাব।" মোহন বলিল"আচ্ছা যেয়ো,আমি জ্যেঠাইমাকে বুঝিয়ে বলব এখন।"

সে কাঁদিয়া বলিল, "জ্যেঠাইমা শুনবেন না—যেতে দেবেন না।"

মোহন বলিল "যাতে শোনেন আমি তাই করব—তুমি কেঁদ ন.

মোহন তাহার অশ্রু মুছাইতে লাগিল, তাহাকে পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল, আর শীঘ্র যাওয়া হইবে বলিয়া বার বার তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল।

যাহা হউক পরদিন সে স্কুলে যাইবার আগেই জ্যেঠাই-মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

জ্যেঠাইমা তখন বিকালের কুটনা কুটিতেছিলেন, কুটিতে কুটিতে বলিলেন,—"কি রে মোহন—এখানে যে?"

মোহন বলিল "এই জ্যেঠাইমা একবার দেখ্‌তে এলুম-আসতে নেই কি?"

জ্যেঠাইমা বলিলেন—"আসিস ত নে, এত দিন হাতে করে মানুষ করেছি—এখন ত একবার কাছেও ঘেঁসিস নে।"

মোহন বলিল "দরকার হলেই আসি।"

জ্যেঠাইমার হাত বটিতে রহিল—তিনি মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দরকারটা শুনি?'

মোহনের আর কথা বাহির হইল না, যেন থতমত খাইয়া বলিল, "এই দেখাশুনার দরকার—তুমি ত আর ডাকনা, জ্যেঠাইমা।"

জ্যেঠাইমা বলিলেন "ডাকতে কি পারি? তোরা বাড়ীর ভিতর দুঘণ্টা বসলে তোর বাবা রাগ করে। দেখলি ত কিশোরি ফেল হল—তোর বাবা রাগ করলে আমার উপর! তা বস্ ঐ সিন্ধুকের উপর।"

মোহন বলিল—"না জ্যেঠাইমা, শিবপুর যাচ্ছি। কাল বিকালে আসব, ছুটি আছে।" বলিয়া মোহন চলিয়া গেল, দেখিল আজ সে কথা বলা তাহার পক্ষে অসম্ভব। ভাবিল কাল আসিয়া বলিবে। পরদিন আসিয়া দেখিল—জ্যেঠাইমার মেজাজ বড় ভাল নাই।

মোহনকে দেখিয়া তিনি বলিলেন "ও মোহন—এমনো মেয়ে ঘরে এনেছিস, মুখে একবার হাসি দেখলুম না, আর কোন কথাই মুখে নেই কেবল 'যাব যাব'!"

মোহন সুবিধা পাইয়া বলিল, "জ্যেঠাইমা! তা পাঠিয়ে দাও না কেন বাবু।"—

জ্যেঠাইমা বলিলেন—"একেত স্বভাব চরিত্রের ছিরি ঐ! বৌমানুষ একবার মাথায় কাপড় ওঠে না (কাল তিনি একবার মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র মাথা খোলা দেখিয়াছিলেন) রোজ রোজ বাপের বাড়ী গেলে শিক্ষে বেশ হবে ভাল!"

মোহন বলিল—"ছেলেমানুষ, নিতে এলে পাঠালে না, সেটা কি ভাল?"

শাশুড়ি বলিলেন, "বৌত নয় এ যে রাক্ষসী—তোকে শুদ্ধ যে যাদু করেছে, তাই বুঝি তুই কাল সকালে এখানে এসেছিলি।"

মোহনের রাগ হইল—বলিল "হ্যাঁ জ্যেঠাইমা, সেই

কথাই না হয় বল্‌তে এসেছিলুম তাতে এমনি কি দোষ হয়েছে।”

জ্যেঠাইমা বলিলেন,—‘বটে এত দূর! ওমা তাই তো আমি কোথায় যাব মা।”

ইহার পর তাঁহাদের দুই এক কথায় বেশ চলিল, কর্ত্রী ঠাকুরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন, দাসী চাকর যাহাকে সম্মুখে দেখিলেন—সকলকেই বলিলেন, “মোহন স্ত্রীর হইয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া করিতেছে।” কিশোরী বাড়ী আসিলে তাহাকেও ঐ কথা বলিলেন, ঠাকুর-পোকে বাহির বাটী হইতে ডাকাইয়া ঐ কথা বলিলেন। কুঞ্জমোহন সব শুনিয়া বলিলেন—“বটে, এর মধ্যে স্ত্রীর ভেড়ো হয়েছে! তা স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাতে চায় পাঠাক্—আর আনতে না পাঠালেই হ'ল।”

এই অবিচারের কষ্টে মোহন নীরবে জ্বলিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মোহন হিত করিতে গিয়া বিপরীত করিয়া বসিল। স্নেহলতার আর শীঘ্র জগৎ বাবুর বাড়ী যাইবার বড় আশা রহিল না। পিতার অবিচারে মোহন যত না কষ্ট পাইল স্নেহের কষ্ট ভাবিয়া তাহার ততোধিক কষ্ট হইল।

আমাদের দেশে বধূদিগের কষ্টই বিখ্যাত, কিন্তু ইহা-দিগের স্বামী-বেচারাগণের কষ্ট ইহাদের অপেক্ষা কোন অংশেই যে ন্যূন তাহাত মনে হয় না। স্ত্রীর প্রতি গুরুজনের অবিচার দেখিলে স্বামী যদিও লোকাচার ভয়ে, গুরুজন ভয়ে মুখে সাধারণতঃ স্ত্রীর হইয়া কিছু বলিতে পারেন না, কিন্তু নীরবে এজন্য তিনি যথেষ্ট সহ্য করেন। বধূদিগের সহস্র দুঃখের মধ্যেও এই সহানুভূতি সান্ত্বনা আছে। কিন্তু স্বামীর একে উক্ত নীরব জ্বালা, তাহার উপর কোন দিক হইতেই প্রায় তাঁহার অদৃষ্টে সহানুভূতি নাই। স্পষ্ট অস্পষ্টভাবে স্ত্রীর পক্ষ লইলে গুরুজনের লাঞ্ছনা, না লইলে স্ত্রীর অভিমান।

যেখানে অবস্থা অন্যরূপ, যেখানে স্বামী উপার্জ্জন করেন—স্ত্রী গৃহিণী, সেখানে স্ত্রীর কোন কষ্ট নাই। সংসার ক্ষমতার-বশ, সুতরাং স্বামীর আত্মীয়বর্গ সেখানে তাঁহারই অধীন, তাঁহারই অনুগ্রহ-ভাজন; এবং সাধারণতঃ সেখানে তিনিও এই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং এস্থলেও স্বামীর অবস্থা সমানই শোচনীয়। স্ত্রী অন্যায় করিলে আত্মীয়দিগের নিকট তিনিই অপরাধী, স্ত্রীকে কিছু বলিলেও তিনি স্ত্রীর নিকট অপরাধী, উভয়দিক হইতেই তিনি 'পক্ষপাতী'। এরূপ স্থলে স্বামীবেচারাগণ ঠিক যেন খেলিবার গোলা, নিজের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ অনধিকার, তাঁহার অস্তিত্ব কেবল পরের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য।

যাহা হইক এখানে আপাততঃ এতকথা অপ্রাসঙ্গিক, কেননা স্ত্রীর জন্য মোহনের সহ্য করিতে হইলেও স্ত্রীর অভি-মান এখনো তাহার সহ্য করিতে হয় নাই।

যে দিন জ্যেঠাইমার সহিত মোহনের বিবাদ হইল, সে রাত্রে সে যখন অন্তঃপুরে শুইতে গিয়াছিল—তখন স্নেহলতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং সেদিন শিবপুর যাইবার আগে আর তাহার সহিত কোন কথাই হইল না? সে কেবল শুইবার আগে বিছানায় বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নেহের সেই নিদ্রিত বিষণ্ণ বালিকা-মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল, তাহার পর সেই বিষণ্ণ বালিকা-মুখ চিন্তা করিতে করিতে শুইয়া পড়িল। রাত্রে তাহার ভাল ঘুম হইল না; মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নে চমকিয়া উঠিতে লাগিল, অবশেষে একেবারে যখন জাগিয়া উঠিল তখন প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু তখনো চন্দ্র অস্তমিত হয় নাই, দেখিল উষার আলোক ক্ষীণ চন্দ্রালোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিতেছে এবং সেই রজত-শুভ্র স্নিগ্ধ ভাতি স্নেহের সরল সুন্দর মুখে অতি মধুর সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়াছে। মোহন কাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অতৃপ্তচিত্তে সেখান হইতে চলিয়া গেল। সমস্ত পথ কেবল মোহনের সেই বিষণ্ণ বালিকা-মুখ-কান্তি মনে পড়িতে লাগিল, সমস্ত জীবন তাহা তাহার স্মৃতি বিজড়িত হইয়া ছিল, বিদেশে অপরিচিতের মধ্যে ঐ মুখ খানি চোখের সম্মুখে দেখিয়াই সে একদিন জগৎ বিস্মৃত হইয়াছিল।

এ দিকে চারুর মুখে সব শুনিয়া জগৎ বাবুর বড় রাগ হইল। কিন্তু মেয়ে যার তাহার কি আর রাগ করা সাজে? কিল খাইয়াও তাহার কিল চুরি করিতে হয়! জগৎ বাবু

কুঞ্জ বাবুর সহিত দেখা করিলেন, কিন্তু বিবাদের দিক দিয়াও গেলেন না, বলিলেন, "কিহে বেহাই, কাল স্নেহকে পাঠাইবে সব ঠিক ঠাক, মাঝে হইতে এ আবার কি ?"

কুঞ্জ বাবু বলিলেন—"মেয়েদের ব্যাপার জান ত! আমাদের ওতে কোন হাতই নেই। তা কিছু মনে করো না, জামাইষষ্ঠি ত শীঘ্র আসছে, তখন নিয়ে গেলেই হবে। গিন্নি বড় রেগে আছেন, এ কটা দিন যাক।"

কুঞ্জ বাবু যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াকে এত সন্তুষ্ট করিয়া চলেন তাহার কারণ এই, তাঁহার অধিকৃত বিষয়ের এক তৃতীয়াংশ ইঁহার প্রাপ্য। ইনি রাগ করিয়া যদি স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন ত সে অংশ কুঞ্জ বাবুর হাত ছাড়া হইয়া যায়। জীবনের মার লোক বল অর্থ বল কিছুই নাই, তাই তাহাকে তিনি স্বচ্ছন্দে ফাঁকি দিতে পারিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে সে সম্ভাবনা নাই। ভ্রাতৃজায়া-ঠাকরুণের আত্মীয়গণের এই বিষয়ের উপর প্রখর দৃষ্টি, তাঁহারা সর্ব্বদাই ইঁহাকে পিত্রালয়ে আসিয়া থাকিতে পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু কুঞ্জ বাবু ইঁহাকে এত দূর বশ করিয়া লইয়াছেন যে তাঁহার সংসার ফেলিয়া ইনি যাইতে পারেন না।

কুঞ্জ বাবুর গৃহে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কিরূপ প্রাধান্য তাহা জগৎ বাবু জানিতেন, সুতরাং বুঝিলেন কর্ত্রীর বিনা অনুমতিতে কিছুই হইবে না, তিনি ইহার পর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু কর্ত্রীঠাকরুণ আজ অটল, কিছুতেই জামাইষষ্ঠির আগে বৌকে তাঁহার বাড়ী যাইতে দিতে সম্মত হইলেন না।

বাড়ী আসিয়া গৃহিণীর নিকটও জগৎ বাবুর লাঞ্ছনার শেষ রহিল না। চারু টগর স্নেহকে আনিতে গেল, আর বেয়ান কি না মেয়ে পাঠাইল না! এতদূর অপমান! এ অপমান গৃহিণী জগৎ বাবুর ন্যায় প্রশান্ত ভাবে অবশ্য গ্রহণ করেন নাই, গৃহিণী দাসী পাঠাইয়া বেয়ানকে দু কথা শুনাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, 'আর কি—না হয় মেয়েকে আর না পাঠাবে এই বইত নয়?'

জগৎ বাবু বলিলেন—"তাহা করিতে হইবে না, আমি নিজে গিয়া যা বলিবার বলিব। স্নেহকে লইয়াও আসিব।" কিন্তু জগৎ বাবু যখন মুখ চুন করিয়া একাকী ফিরিয়া আসিলেন, তখন গৃহিণীর মুখ বড় বাড়িয়া উঠিল। জগৎ বাবু উভয় সঙ্কটে পড়িলেন, আর স্নেহলতার দুর্দ্দশাও বাড়িল। চারু টগরের তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া একেবারে বারণ হইয়া গেল। অবশ্য জগৎ বাবু তাহাকে মাঝে মাঝে দেখিয়া আসিতেন, গৃহিণী তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

ইহার ১০।১৫ দিন পরে জামাইষষ্ঠির উৎসব আসিয়া পড়িল। আগের দিন জগৎ বাবু নিজে কুঞ্জ বাবুর নিকট গিয়া জামাতা কন্যাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। পরদিন দাস দাসীগণ তত্ত্ব লইয়া গেল। তত্ত্ব আসিতে দেখিয়াই জ্যেঠাইমা নাসিকা উত্তোলন করিলেন, একেই ত তাঁহার খুঁৎধরা স্বভাব, তাহার উপর স্নেহলতার সম্পর্ক যেখানে আছে—আজ কাল সেখানেই তাঁহার বিষদৃষ্টি। আম দেখিয়াই তাঁহার মনে হইল তাহা বোম্বাই নয়, মিষ্টান্ন না

দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন—তাহা নেহাৎ ওঁছা বাজারে, কাপড় জোড়ার প্রতি আড় নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—এমন খেলো কাপড় তিনি জন্মে দেখেন নাই। এইরূপে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাষ্যের টিপ্পনি প্রয়োগ করিয়া উপসংহারে বলিলেন—"এত অশ্রেদ্ধার তত্ত্ব করাই বা কেন? কেইবা তা প্রত্যাশ করে বসে ছিল!"

গৃহিনীর দাসী কমলির আর সহ্য হইল না, গৃহিণী তাহাকে বলিয়াও ছিলেন—স্থবিধা পাইলে যেন শ্বাশুড়ি মাগীকে দু কথা বলিতে না ছাড়ে।

সে বলিল "হায় হায়! ধাবু বেনা বনে মুক্তা ছড়িয়েছেন গো!"

আর কি রক্ষা আছে, শ্বাশুড়ি জ্বলিয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন—"এ মাগী কি বলে? এ তত্ত্ব পাঠান—না অপমান করা? বেরো সর্ব্বনাশী, তোদের তত্ত্ব নিয়ে যা।"

কমলি এতদূব হইবে মনে করে নাই, সে থমকিয়া গেল, অন্য সকলেরি আত্মাপুরুষ শুকাইয়া উঠিল।

হারার মা বলিল—"হেঁাই মা, বেয়ান ঠাকরুণ রক্ষা কর ওর কথা কিছু মনে করো না, ও একটা ক্ষ্যাপা। মা-ঠাকরুণ ত আর ও কথা বলতে বলেন নি।"

জ্যেঠাইমা বলিলেন—"বলতে বলেনি? সেই বলেছে দাসীর নাকি অত বড় আস্পর্দ্ধা! তা মাঠাকরুণ তোদের তোদেরি আছেন, আমার তিনি কি করবেন? বেরো সর্ব্ব-নাশীরা বেরো।"

মহা গোল বাধিয়া গেল, দাসীরা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল,

খাশুড়ি হন হন করিয়া থড় থড়ি ঘরে আসিয়া "ঠাকুর পো ঠাকুর পো" করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, ঠাকুর পো সশঙ্কিত হইয়া উপস্থিত হইলেন, কর্ত্রী বলিলেন—"তোর সংসারে আর আমি থাকব না—বেয়াই বাড়ীর লোক এসে এরূপ অপমান করে!" তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে এমন দশখানা সাজাইয়া বলিলেন যে কুঞ্জ বাবুও নূতন কুটুম্বের বেয়াদবীতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, বেয়ান ঠাকরুণ যে তাহাদিগকে অপমান করিতেই দাসীদের শিক্ষিত করিয়া পাঠাইয়াছেন—তাহাতে তাঁহারও সন্দেহ রহিল না। তিনি বলিলেন "সওগাৎ ফেরত দাও। বেহাইকে আমি সমস্তই বলিয়া পাঠাইতেছি।"

তিনি পত্র লিখিতে বাহিরে গেলেন। জগৎ বাবুর দাস দাসীগণ সওগাৎ লইয়া চূনমুখে ফিরিয়া গেল, কর্ত্রী ঠাকুরাণী কাতরহৃদয় রোরুদ্যমান স্নেহলতাকে সুতীব্র ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। "ঐ লক্ষ্মীছাড়ীই ত যত নষ্টের গোড়া, ঐ জঞ্জাল ঘরে এনেই ত ঘরে আগুণ লাগলো!" এই সময় পশ্চাৎ হইতে একজন বলিল—"জঞ্জাল রাখার আবশ্যক কি? উঁহাকে পাঠাইয়া দাও না?"

কর্ত্রী ফিরিয়া দেখিলেন—মোহন। এই মাত্র সে বাড়ীতে পা দিয়াছে। তাহার সাহসে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, স্ত্রীর হইয়া এরূপ স্পষ্ট কথা! বলিলেন "ও বাবারে কোথায় যাব! এমন রাক্ষসীর হাতে ছেলেকে দিলুম! আমাদের খুড়ি জ্যেঠাই বলে আর গ্রাহ্যিই নেই?"

তিনি মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে আর এক বার খড়্

খড়ি ঘরের দিকে ছুটিলেন। ইত্যবসরে মোহন স্নেহলতাকে গিয়া বলিল—"এস পাল্কীতে এস, তোমার জন্য নীচে পাল্কী ঠিক রাখিয়া আসিয়াছি।" মোহন বাড়ী ঢুকিবার সময় পাল্কী বেহারাদের চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহাদের বসিতে বলিয়াছিল। ভিতরে যে কি ব্যাপার হইয়াছে সে তখনো জানিত না, ভাবিয়াছিল "কোন গতিকে জ্যেঠাইকে প্রসন্ন করিয়া দেখি যদি স্নেহকে পাঠাইতে পারি।"

কিন্তু তাহা পারিল না, তাহাকে অপ্রসন্ন করিয়াই পাঠাইতে উদ্যত হইল। স্নেহলতা যদি জানিত সে চলিয়া গেলে মোহনের কিরূপ সহ্য করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহার পদ সেই গৃহেই আবদ্ধ থাকিয়া যাইত, কিন্তু স্নেহলতা বালিকা, স্বামীর কথায় তাহার নিজের সুখ-রাজ্য সে কেবল উদ্ঘাটিত দেখিল, স্বামীর স্নেহ সে পূর্ণ উচ্ছ্বাসভরে গ্রহণ করিল, সে তাহার সঙ্গে পাল্কীতে গিয়া উঠিল, ইহার পরিণাম আর সে দেখিল না।

যখন স্নেহলতা চলিয়া গেল তখন কুঞ্জ বাবু কি জ্যেঠাইমা তাহা জানিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন—তখন তাঁহারা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন। জ্যেঠাইমা স্নেহলতার উপর গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন; কুঞ্জ বাবু মোহনকে জানাইয়া দিলেন—"তাঁহার বাড়ীতে আর তাহার স্থান নাই। তাঁহার উপর সে যেন কোন প্রত্যাশা না রাখে! সে তাঁহার পুত্র নহে, সে কুলাঙ্গার।"

মোহন সেদিন জগৎ বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া জগৎ বাবুকে সমস্তই বলিল। জগৎ বাবু শুনিয়া নিতান্তই দুঃখিত

হইলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে শিবপুরের ব্যয় লইবার জন্য মোহনকে অনুরোধ করিলেন। শ্বশুরের নিকট হইতে সাহায্য লইতে তাহার লজ্জা বোধ হইল, কিন্তু অন্য উপায় নাই, ঋণ স্বরূপ তাহা লইতে সম্মত হইয়া সে তখন আর এক প্রস্তাব করিল। বলিল—"শিবপুরে পাঁচ বৎসর না পড়িয়া এঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় না, কিন্তু রুরকিতে আড়াই বৎসরেই শেষ পরীক্ষা, সুতরাং তাহার এখনকার অবস্থায় রুরকিতে যাওয়াই ভাল। দেড় বৎসর পূর্ব্বেই, তাহা হইলে সে উপার্জ্জন-ক্ষম হইবে।" জগৎ বাবুও ইহা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন। তাহাই স্থির হইল, এক হপ্তার মধ্যেই মোহন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এ সংসারে কাহাব জীবনের সহিত কাহার সম্পর্ক কিছুই বোঝা যায় না। পিতাপুত্রে বিবাদ হইল, মোহন কুঞ্জ বাবুর অবাধ্য হইয়া স্বাধীন ভাবে রুরকিতে চলিয়া গেল, ইহার ফলভোগ করিতে হইল—জীবনের মার।

পিতার সাহায্যে বঞ্চিত হইয়াও যে মোহনের কিছু ক্ষতি হইল না—উপায়হীন দীনহীন ভাবে তাহাকে যে পুনর্ব্বার তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইল না—এই জন্যই আরো বিশেষরূপে কুঞ্জ বাবু তাহার প্রতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার

সাহায্যকারীগণের প্রতি মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন। জ্যেঠাই-মাও রাগ করিতে কিছু কম করিলেন না—কিন্তু তাঁহার রাগ মোহনের উপর তত নহে যত স্নেহলতা এবং তাহার দল-বলের উপর। "সেই সর্ব্বনাশী হইতেই এমনটা ঘটিল—সংসার ছারখারে গেল!"

সৌভাগ্যবশতঃ স্নেহলতা এবং মোহন এখন তাঁহাদের আয়ত্তের বাহিরে—তাই এই ক্রোধের দংশন জ্বালা তাহা-দিগকে সহ্য করিতে হইল না, কিন্তু সেই জন্যই—যাহারা এই ক্রোধ-গ্রাসের মধ্যে পড়িল—তাহাদের বড় বেশী রকম সহ্য করিতে হইল। ক্রুদ্ধ সর্প পাত্রাপাত্র মানে না, যাহারা সৌভাগ্যবান তাহারা এড়াইয়া যায়—যাহারা দুর্ভাগ্য, তাহারা সম্মুখে পড়ে। অন্য কাহারো কিছু করিতে না পারিয়া—কুঞ্জ বাবু এবং তাঁহার ভ্রাতৃজায়া অবশেষে আপনাদিগের সংযুক্ত ক্রোধ-বজ্র নিরীহ জীবনের মার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন,—তাঁহার অপরাধ তিনিই স্নেহ-লতার সহিত প্রথমে মোহনের বিবাহ প্রস্তাব করেন।

যখন জগদম্বা দেবী শুনিলেন মোহনকে জগৎ বাবু রুরকী পাঠাইয়াছেন, তখন সত্যই তিনি জগদম্বার মত সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড জিহ্বা অবিরল বেগে মোহনের বন্ধুবর্গের (তাঁহার বিবেচনায় বৈরীবর্গের) মুণ্ডনিপাতনে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাঁহার দুইভুজ দশভুজা আকারে ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল! এরূপ সময়ে দাস দাসীদিগের বড়ই আমোদ, তাহারা তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া নানারূপ অভিনন্দন ও অনুমোদন

বাক্য বর্ষণে তাঁহাকে দ্বিগুণ উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

সে দিন একাদশী, কর্ত্রীর আহারের বালাই নাই, সুতরাং তিনি হরিনামের মালা হাতে করিয়া সমস্ত দিনটা নির্ব্বিঘ্নে মনের সাধে এইরূপে পরের স্বর্গারোহণ ও সদ্গতি কামনায় যাপন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার পরোপকারী প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ প্রশমিত না হওয়ায় বিকালে প্রিয়দাসী ক্ষেমঙ্করীকে ডাকিয়া বলিলেন—"ক্ষেমি তুই একবার পোড়ারমুখোটার বাড়ী যেতে পারিস, একবার ভাল করে দু কথা না শোনালে আমার মন যে ঠাণ্ডা হচ্ছে না?"

ক্ষেমি বলিল,—"ডাক্তার বাবুর বাড়ী! না বাবু তা পারব না, পরের বাড়ী—আমাকে যদি ঝাঁটা মেরে তাড়িয়েই দিলে—তখন মুখখানা থাকবে কোথায়?"

জগদম্বা বুঝিলেন—ঠিক কথা, বলিলেন—"তবে একবার জীবনের মার বাড়ী যা, তাত পারবি! আমার নাম করে এই কথা গুলো একবার ভাল করে শুনিয়ে দিয়ে আয়, দেখিস একটা কথা কমিয়ে জমিয়ে বলিসনে।"

জীবনের মাকে গালি দিতে যাইতে ক্ষেমি কোন আপত্তি দেখিল না, জোর করিয়া বলিল—"হ্যাঁ, তা আর পারব না—আমাকে আবার শেখাতে হয় গা? ধুড়ধুড়ি নেড়ে দিয়ে আসব। এই আমি চল্লুম।"

ক্ষেমি চলিয়া গেল—একটু পরে কর্ত্রী ঠাকুরাণী হাঁকিলেন—"ও ক্ষেমি ক্ষেমি গেলি কি?" ক্ষেমি নীচে হইতে উত্তর করিল "না এখনো যাইনি—এই বাসন কখানা ধুয়ে যাব।"

কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিলেন—"তোর গিয়ে কাজ নেই—একখানা পাল্কী ডাক আমিই যাচ্চি। সে কিতম্বি হতভাগীর বুকের পাটা কতখানি একবার দেখে আসি।"

ক্ষেমির জিহ্বা-শক্তির প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস সত্বেও বর্ত্তমান স্থলে তিনি তাহার উপর নির্ভর করিতে পারিলেন না,—একাদশীর উপবাস—এবং সমস্ত দিনের চীৎকার ক্লান্তি ভুলিয়াও অবশেষে স্বয়ং জীবনের মার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে বাক্যবাণে বিঁধাইয়া, জর্জ্জর আকুল করিয়া তুলিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

কর্ত্রী ঠাকরুণত এইরূপে জীবনের মাকে মুখের কথায় প্রতিশোধ প্রদান করিলেন, কিন্তু কর্ত্তা বাবুর প্রতিশোধ ফাঁকা কথার গর্জ্জন নহে। ইহার পর নিয়মিত সময়ে যে দিন জীবনের ভৃত্য কুঞ্জবাবুর নিকট মাসহারা চাহিতে গেল; সে দিন সে শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"মা, মাসহারা বন্ধ।"

এ দিকে সেদিন বিকালে জীবন বি-এ পাশের খবর লইয়া বড় আহ্লাদে বাড়ী ফিরিতেছিল। ইহার মধ্যেই মনে মনে সে নবজীবন আরম্ভ করিয়া ফেলিয়াছে। জীবন প্লীডার হইতে চায়, এজন্য এখনো দুই বৎসর তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু আশার দৃষ্টিতে, কল্পনার স্বপ্নে কালের ব্যবধান সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার চোখে বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ আপাততঃ একই হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ব্যতীত সে এখন আর কিছুই দেখিতেছিল না।

পাঠক হাসিওনা—যৌবনের উৎসাহে জীবনের আরম্ভে আপনার প্রতি কাহার না অসীম বিশ্বাস? আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে কে তখন সন্দেহ মাত্র করে?

এখন জীবন মনে মনে একজন প্রতিষ্ঠালব্ধ লীডার, সম্মুখে তাহার অতুল যশ, অতুল ঐশ্বর্য্য। কিন্তু এ যশ এ ঐশ্বর্য্য তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র; অদূরে ঐ তাহার কাম-ভূমি ইংলণ্ড বিদ্যমান, জীবন তাহাতে পদার্পণের সুখ অনুভব করিতেছিল। এইরূপ হৃদয়ভাব, আশা, আনন্দ, কল্পনা লইয়া দ্রুতপদে সে বাড়ী আসিয়া পৌছিল। বাড়ীর সদরে ভৃত্যকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মা কোথায়?"

ভৃত্য উত্তর করিল "উপরে।"

কিন্তু জীবনের উপরে উঠিবার সবুর সহিল না, নীচে হইতেই "মা" "মা" করিয়া ডাকিতে ডাকিতে লম্ফে লম্ফে সোপানাবলী উত্তরণ করিয়া বারান্দায় আসিয়া পড়িল। জীবনের-মা তাহার অপেক্ষায় প্রতিদিন যেমন এ সময় বারান্দায় বসিয়া থাকিতেন, আজও সেইরূপ ছিলেন। কিন্তু অন্য দিনের মত হাসিয়া তিনি জীবনকে আদর করিয়া লইলেন না—তাহার নয়নে অশ্রু, মূর্ত্তি বিষণ্ণগম্ভীর। তাঁহাকে দেখিয়া জীবনের মুখের কথা মুখেতেই রহিয়া গেল। সে মায়ের পাশে আসিয়া বসিয়া বলিল,—"মা, কি হয়েছে? আবার কি জ্যেঠাই-মা এসে ঝগড়া করে গেছেন নাকি?" জীবনের-মা বলিলেন—"না, বাবা। তোমার কাকা আমাদের মাসহারা বন্ধ করেছেন। কি করে বা দাসী চাকরদের মাইনে দিই—আর ডাল চাল আনাই। আর সব ত আগেই

গেছে, এক কর্ত্তার যে ঘড়ি চেনটি তোর জন্যে রেখেছিলুম, তাও আজ বাঁধা দিতে পাঠাতে হ'লো।"

কঠোর বজ্রশব্দে জীবন তাহার সুখস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। জীবনের-মা অশ্রু মুছিয়া বলিলেন—"বাছা, সংসারে অনেক দুঃখ সয়েছি। ভেবেছিলুম তোকে সে সব কিছু জানতে দেব না, ঠাকুর-পো সে সাধেও বাদ সাধ্‌লে।"

জীবন কিছু উত্তর করিল না, উপরের সুবিস্তৃত আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। অপরাহ্ন অবসান-প্রায়, মেঘের নানা বর্ণ-বিন্যাস মিলাইয়া গিয়াছে। গগণতল এখন অতি ম্লান নীলশুভ্র। চক্রবাক পক্ষীর দীর্ঘ শ্রেণী সেই স্নিগ্ধ ম্লান গগণখণ্ড অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, দুই-খানি ঘুড়ি অবিশ্রান্ত বেগে উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে হঠাৎ নামিয়া পড়িল। জীবনের আশা কল্পনারও বুঝি এই পরিণাম! জীবন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মাতার দিকে চাহিল। আকাশের ম্লানবর্ণ মাতা পুত্রের মুখে পড়িয়া তাহাদের বিষণ্ণ মুখ কি দারুণ বিষণ্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। জীবনের সেই ম্লান মুখ দেখিয়া মাতার বুক ফাটিয়া উঠিল। তিনি চক্ষু নত করিয়া অশ্রু মুছিতে লাগিলেন। জীবন সংযত হইয়া ধীরে ধীরে বলিল,"—মা আমি পাশ হয়েছি—৩০ টাকা জলপানী পাব—তাতে চলবে না?"

জীবনের-মা সেই কথায় হঠাৎ যেন অকূল সাগরে কূল দেখিতে পাইলেন, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "হরি দয়াময়—তুমি আছ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তুমি থাকিতে কে আমাদের অকূলে ভাসায়?"

মাতাকে আশাযুক্ত দেখিয়া জীবনও আশ্বস্ত হইল। প্রথম আবেগ শমিত হইলে কিছু পরে জীবনের-মা আবার বলিলেন—"৩০ টাকায় দৈনিক বাজার খরচটা আমাদের চলে যাবে। কিন্তু আরো ত অন্য খরচ আছে। বামুন-ঠাকরুণকে জবাব দিয়ে আমি নিজে রাঁধব, দুট চাকর দাসীও জবাব দেব। কিন্তু বাজার হাট আছে, ঘরের কর্‌না আছে—একটা দাসী একটা চাকরও ত চাই। তা ছাড়া তোরও ত আর দু বছর পড়া বাকি? সে খরচ—"

জীবন বলিল—"মা, তুমি ভেবোনা, আমি চাকরী করব বি-এ পাশ হয়েছি—একটা চাকরী সহজেই মিলবে।"

ছেলের আইন পড়ার কত সাধ তাহা জীবনের-মা জানেন সুতরাং এই কথায় তাঁহার বড় দুঃখ হইল—বলিলেন, "চাকরী করতে করতে কি পড়া হয়?"

সে বলিল—"তা হবে না কেন, হয়।"

মা বলিলেন, "কিন্তু চাকরীও ত মেলা সহজ নয়—মুরুব্বি চাই। আমার মামাত ভাই চারটে পাশ দিয়েছে, কিন্তু তার মুরুব্বি নেই, তাই এত দিন চেষ্টা বেষ্টা করে ৩০ টাকার একটা মাষ্টারি বই কিছুই জুট্‌লো না। তা আমাদের মুরুব্বিই বা কৈ? এক জগৎ বাবু—তা তিনি যদি কিছু উপায় করেন।"

জীবন স্বভাবতঃ আশ্বস্ত হৃদয়, মাতার কথায় সে নিরাশ হইল না, চাকরী করিতে ইচ্ছা করিলে যে সহজে চাকরী মিলিবে না—ইহা তাহার মনেই হইল না, সে বলিল "আচ্ছা জগৎ বাবুকে ত প্রথমে বলে দেখা যাক্—না হয় পরে

অন্য চেষ্টা দেখব।" তাহাই স্থির হইল, পরদিন মাতা পুত্রে জগৎ বাবুর বাড়ী গমন করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

জগৎ বাবুর অন্তঃপুরে—সেই পূর্ব্বোক্ত পরিচিত শয়ন কক্ষে—সেই জীর্ণ মাদুর পাটির উপর বসিয়া জীবনের-মা জগৎবাবুর স্ত্রীকে তাঁহার দুঃখের কথা কহিতেছিলেন। তাঁহাদের কথায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আজ আর কেহ সেখানে ছিল না। টগর "ঠাকুর-পো"দের বাড়ী গিয়াছে, স্নেহলতা অন্য ঘরে। প্রয়োজন না হইলে সে আপনা হইতে গৃহিনীর ঘরে বড় আসে না।

জীবনের মার দুঃখের কথা শুনিয়া গৃহিনীও চোখ মুছিয়া বলিলেন—"এমন অধর্ম্মে লোক গা! বিষয় সব দখল ক্লল্লে আর ভাইপোকে পথে দাঁড় করালে! ভগবান এত অধর্ম্ম কখনোই সইবেন না। আমি বলছি, জীবনের মা, তোদের ধন তোদেরি হবে। কিছু দিন সবুর কর, এর শাস্তি ওকে পেতেই হবে।"

জীবনের মা অশ্রু মুছিয়া বলিলেন—"আমি বোন তা চাইনে, আমার কিশোরী, মোহন ভাল থাক, কুঞ্জমোহন দুঃখ না পাক, তবে আমাদের বিষয় আমরা ফিরে পেলেই হোল। এতটুক ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছি দিদি—ভেবে-

ছিলুম ছেলের কষ্ট যেন না দেখতে হয়। এ সুখও বিধাতা দিলে না, এই দুঃখু।”

গৃহিণী বলিলেন—“কাঁদিসনে জীবনের-মা, হবে সব হবে, তোর ছেলে দুঃখু পাবে না। অত সুবোধ ছেলে লেখা-পড়ায় অত মন ও আর কিছু ক’রে উঠতে পারবে না! তা অনেক দিন জীবনকে দেখিনি, বাছা ছোট বেলায় সৰ্ব্বদাই আসত, আর আনিসনে কেন?”

জীবনের-মা বলিলেন—“সেও বাইরে জগৎবাবুর কাছে এসেছে—যদি চাকরী বাকরী একটা করে দিতে পারেন। তোমরাই ত বোন আমাদের একমাত্র ভরসা.

গৃহিণী বলিলেন—“তা চাকরী হবে বই কি—যাতে হয় তা আমি দেখব, তোরা কি শেষে পথে গিয়ে দাঁড়াবি নাকি!”

দুঃখে নহে, কৃতজ্ঞতার প্রাচুর্য্যে এবার জীবনের-মার চক্ষু জলপূর্ণ হইল। চিরজীবন তিনি গৃহিণীর পূর্ণ মমতা পাইয়া আসিতেছেন, অথচ তিনি তাঁহার কে? রক্তসম্পর্কে তিনি তাঁহার কেহই নহেন! দুই জনের পিত্রালয় এক পাড়ায়, এই হেতু তাঁহারা বাল্য সখীত্বে আবদ্ধ মাত্র। এই সখীত্ব গৃহিণী আজীবন সমান ভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

পাঠক যদি স্নেহলতার প্রতি ব্যবহার হইতে গৃহিণীকে হৃদয়-হীন ভাবিয়া থাকেন ত তাঁহার সে ভ্রম এবার দূর হইবে। বাস্তবিক তিনি নির্ম্মম কিম্বা দানকুণ্ঠও নহেন। তিনি যাঁহাকে ভালবাসেন, যাঁহাদের আত্মীয় মনে করেন—অকুণ্ঠিত-চিত্তে তিনি তাঁহাদের কষ্ট প্রশমন করিতে উদ্যত। তবে তাঁহার এই মমতার ভাব সার্ব্বভৌম উদারতার উপর

স্থাপিত নহে, অন্ততঃ জগৎ বাবুর আত্মীয় স্বজনের প্রতি সব সময় তাঁহার এ ভাব অকাতরে পৌঁছায় না।

জীবন আসিয়াছে শুনিয়া গৃহিনী যথার্থই সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন—"এসেছে, বেশ করেছে, চাকরী একটা হবেই। তা বাইরে এল এখানে একবার আসবে না? ও হারার-মা বাইরে থেকে জীবনকে একবার ডাক দেখি।"

হারার-মা তখন বিছানা করিবার জন্য ঘরে ঢুকিতে-ছিল—কিন্তু আর না ঢুকিয়া অমনি বাহিরে চলিয়া গেল। কিছু পরেই বারান্দায় জুতার শব্দ শোনা গেল, স্নেহলতা অন্য ঘর হইতে ভাবিল জগৎবাবু আসিতেছেন—সে তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, একজন অপরিচিতকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর অপ্রস্তুত হইয়া দৌড়িয়া চলিয়া গেল।

জীবনকে দেখিয়া গৃহিনীও বিস্মিত হইলেন। প্রায় আট দশ বৎসর জীবন এখানে আসে নাই—সুতরাং তিনি যাহাকে দেখিবেন ভাবিয়াছিলেন তাহার পরিবর্ত্তে এক অপরিচিত সুশ্রী যুবাপুরুষ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

জীবনের সুদীর্ঘ দেহে, প্রফুল্ল বর্ণে, কুঞ্চিত কেশবিন্যস্ত সুগঠিত মস্তকে, বুদ্ধিপ্রকাশক ললাটে, আশা কল্পনা-প্রদীপ্ত আয়ত চক্ষুতে, সুশ্রী নাসিকায়, নবীন শ্মশ্রুযুক্ত সুবঙ্কিম ওষ্ঠাধরে—তাহার সমস্ত আকৃতিতে এক মনোহর সমুজ্জ্বল ভাব—উদার বুদ্ধির মাধুর্য্য প্রস্ফুটিত।

গৃহিনী মাতৃস্নেহপূর্ণ নয়নে সেই মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া পরিতৃপ্ত হৃদয়ে বলিলেন "সেই এতটুকু ছেলে এখন

এত বড় হয়েছে! আহা মরে যাই—বেশ ছিরিমান হয়ে উঠেছে, বেঁচে থাক। বোস, বাছা, কৌচের উপর।"

জীবন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিল।

গৃহিণী জীবনের-মাকে বলিলেন—"বলি, ছেলে এত বড় হয়েছে—এখনো বিয়ে দিসনি কেন—"

জীবনের মা। ঢের বলেছি দিদি, তা ও কি শোনে। তা এখন মনে হচ্ছে—না শুনেছে ভালই হয়েছে—পরের মেয়েকে এনে কেন কষ্ট দেওয়া। নিজে রোজগার ক'রে তখন নিজে বৌ করবে।

জীবন দেখিল বড় বেগতিক এইরূপ কথা চলিলেই তাহার হইয়াছে! সে এ কথা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি বলিল—'মাসীমা, চারু কোথা? তাকে ত দেখলুম না।" জীবনের কৌশল সফল হইল। গৃহিণী বলিলেন—"চারু কোথায় বুঝি বেড়াতে গেছে, এই এল বলে।"

জীবনের-মা বলিলেন—"জীবন, জগৎবাবু চাকরীর কথা কি বল্লেন?"

জীবন। মেট্রোপলিটান স্কুলে ৫০ টাকা মাইনের একটা মাষ্টারী খালি হয়েছে, জগৎবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে আমাকে সঙ্গে করে এখনি নিয়ে যাবেন বলেছেন, তারপর দেখা যাক কি হয়।

গৃহিণী বলিলেন,—"জীবনের-মা তুই কিচ্ছু ভাবনা করিসনে, উনি বল্লে বিদ্যাসাগর মশায় কক্ষণো সে কথা রদ করতে পারবেন না।"

জীবনের-মার মুখে আনন্দ ব্যাপ্ত হইল—তিনি বলি-লেন,—"জগতের ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক —বোন তোরাই আমার যথার্থ আপনার,—আপনার লোকে কেউ এমন আপনার হয় না।"

কিছুক্ষণ এইরূপ-কথাবার্ত্তার পর জীবন বাহিরে চলিয়া গেল, জগৎ বাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে চলিয়া গেলে গৃহিণী জীবনের মাকে বলিলেন, "আর কি বলব বোন—দেখে যেন সন্তানস্নেহ উদয় হোল, মনে হোল যেন আমার চিরকেলে আপনার, এ বোন আমার আপনার না হয়ে যায় না ; জীবনকেই আমার জামাই করব—"

জীবনের-মা বলিলেন "আমার ত তাতে অসাধ নেই। বলে, কাঙ্গলা ভাত খাবি—না হাত ধোব কোথায়। কিন্তু ছেলে এখন করবে না ; কি সোটাটী মোসাটি করেছে —তাতে পিতাজ্ঞে করে বসেছে ২১ বছর না হলে বিয়ে করবে না।"

গৃহিণী। বেশ ত তা আরো দু'বছর যাক না—টগর ত এই শত্রু মুখে ছাই দিয়ে সবে নয়ে পা দিয়েছে—এর মধ্যে কিছু আর সময় যায়নি—তা জানা ঘর, রাখতে তো আর ক্ষেতি নেই।"

জীবনের-মাব ইহাতে অমতের কারণ ছিল না ;—টগর যদিও একটু দুষ্ট—তা ছেলে মানুষ অমন হয়ে থাকে—বড় হলে আপনিই বুদ্ধি হবে। বিশেষ গৃহিণী তাঁহাদের এত করেন—তাঁর কথা তিনি রাখবেন না, আর অমন কুটুম্বই বা আর কোথায় পাবেন !

তবে এ সম্বন্ধে একেবারে পাকা কথা দিতে জীবনের-মা সঙ্কুচিত হইলেন, কেননা জীবনের উপর তাঁহার ভরসা বড় কম, তিনি কথা দিবেন—আর জীবন যদি বাঁকিয়া বসে—সুতরাং তিনি বলিলেন 'তা ভাই ছেলেকে বলব। সে যে খামখেয়ালে, হয়ত বলে বসবে, টাকা কড়ি নেই তোমার ভাত কাপড় যোগাতে পারিনে আবার বিয়ে করব!"

গৃহিণী। সে কি কথা, জীবনের-মা! অত বিষয় রয়েছে—একবার কেবল কোর্টে যাবার অপিক্ষে বইতো না!

জীবনের-মা। তা টাকা নইলে ত আর বোন মোকদ্দমা চলে না।

গৃহিণী। বিয়ে হলে তুই কি ভাবচিস টাকার জন্যে মকদ্দামা আটকাবে? আমি মকদ্দামা চালিয়ে দেব—আমার মেয়ে জামাই কি আমার পর? তাদের সুখ দেখব না!

জীবনের মার নয়নের সম্মুখে নূতন আশার রাজ্য খুলিয়া গেল, তিনি বলিলেন, "তা দিদি, আমার ত খুবই ইচ্ছে এ বিয়ে হয়—"

গৃহিণী। তাই হবে। বিয়েও হবে—বিষয়ও হবে—সবই হবে। কুঞ্জবাবুর মুখখানা তখন একবার দেখব! জানিস, কুঞ্জবাবুর বাড়ীর পাশের যে খালি জায়গা সেই-খানে তাদের চোখের উপর তেতালা বাড়ী ফাঁদবি—মিন্সে আর মাগী জ্বালায় দম আটকে মরবে!"

বলিয়া গৃহিণী অঙ্গ দুলাইয়া মাদুরের উপর বেশ ভাল করিয়া বসিলেন, যেন তাঁহার অভিলাষ বা কল্পনা সেই মুহূর্ত্তেই সফল হইয়া গেল।

জীবনের-মা বলিলেন, 'ভগবান দিন দেন সবই হবে। আমার আর কি—বৌ ছেলে সুখে থাকলেই আমার সুখ।''

গৃহিণী। বৌ ছেলে নাতি নাতনী ঐশ্বর্য্য সম্পৎ সব তোর হবে, দুদিন সবুর কর।

এই রূপে ইহারা জীবনের ভবিষ্যৎ সুখসম্পদ কল্পনা করিয়া এখন হইতে লঙ্কা ভাগে প্রবৃত্ত হইলেন, আর ওদিকে জীবন বেচারা তাহার সে সুখে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়া সামান্য কোন একটি চাকরীর জন্য বিব্রত হইয়া বেড়াইতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যে কর্ম্মের জন্য জগৎ বাবু জীবনকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের কাছে গেলেন, সে কর্ম্ম জীবন পাইবে স্থির হইল। বিদ্যাসাগরের আর্ত্তবৎসলতা ও যোগ্যানুরাগ কে না জানে, জীবনকে দেখিয়া এবং তাহার অবস্থা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার উপকারে প্রতিশ্রুত হইলেন। জীবন কৃতকার্য্য হইয়া বাড়ী প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু ইহাতে তাহার যেরূপ সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল তাহা হইল না।

বরঞ্চ বিপরীত। অন্ন বস্ত্রের চিন্তায় এ দুই দিন তাহাকে যেরূপ বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই উৎকণ্ঠা-মুক্ত হইয়া নিজের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অবসর পাইবা মাত্র একটা দারুণ নৈরাশ্যে সে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার আশা—কল্পনার কি এই পরিণাম! একটা সামান্য চাকরিতেই কি তাহার জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা কামনার অবসান! জীবন তাহার অবস্থার শোচনীয়তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু অধিকক্ষণ তাহার এ তীব্র নৈরাশ্য মনে স্থান পাইল না, সে দেখিল, তাহার বর্ত্তমান জীবন ক্ষণস্থায়ী, তাহার ভবিষ্যৎ আশা সফল করিবার জন্য তাহাকে অল্পদিনের জন্য মাত্র এই জীবন বহন করিতে হইবে, তাহার পর তাহার বাসনার রাজ্য উন্মুক্ত।

জীবনের নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয় বলযুক্ত হইল। আশার আলোকে তাহার হৃদয় ক্রমে ক্রমে আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখন এই কৃতকার্য্যতাতেও ক্রমে সে সন্তুষ্টি অনুভব করিল। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে কে কবে যথার্থ সুখী হইয়াছে! আশাই সুখ। যাহারা সর্ব্বদাই আশাপূর্ণ তাহারাই সুখী!

বাড়ীতে আসিয়া জীবন আর এক রূপে সুখী হইল, মা এই কর্ম্মের খবরে বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি জগৎ বাবুর বাড়ী হইতে সবে মাত্র সেই বাড়ী আসিতেছেন, গৃহিণীর কথাবার্ত্তা তখনো তাঁহার মনে জাগিতেছে, জীবনের ভবিষ্যৎ ধনসম্পদ তখনো সত্যকার মত তাঁহার মনে আন্দোলিত

হইতেছে, এই সময় জীবনের নিকট সুসংবাদ পাইয়া তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইলেন, তাঁহার মনে হইল, তাঁহাদিগের শুভাদৃষ্টের ইহা পূর্ব্ব সূচনা। তিনি আহ্লাদে আত্ম-দমনে অসমর্থ হইয়া বলিলেন "জীবন, বাবা আমার, লক্ষ্মী ছেলে আর 'না' বলিসনে।"

জীবন বলিল—"কিসে?"

মা। এই বিয়েতে। চারুর-মার ভারী সাধ তোকে জামাই করেন। বাবা, তাঁরা আমাদের এত উপকার করেন।

এই কথায় জীবনের স্নেহলতাকে সহসা মনে পড়িল, তাহার ফুলের মত মধুর মূর্ত্তি, সেই বিস্মিত কোমল দৃষ্টি, সেই চকিত পলায়ন ছবির মত নয়নে জাগিল, তাহার টেনিসনের এই দুই লাইন মনে পড়িল—

"Airy fairy Lilian
Flitting fairy Lilian"

সে মনে মনে বলিল, হ্যা যদি এখন বিবাহ করিতাম ত ইহাকে বিবাহ করিতে আপত্তি ছিল না—মুখে বলিল, "মা, তুমি ত জান আমার এখন বিয়ে করার যো নেই। তবে আবার ও কথা কেন?"

মা। তা এখনকার কথা ত হচ্ছে না। চারুর-মা দুবছর এখনো মেয়েকে রাখতে রাজি—যদি কেবল তুই রাজি হ'স।

জী। দুবছর পরে আমাদের অবস্থা কি হবে কে জানে? এখন থেকে ও সব বিষয় কি কিছু ঠিক করা যায়!

মা। বাছা, তা যদি বলিস, বিয়ে করলে অবস্থাও আমাদের ফিরবে। অমন মুরুব্বি পাবি—মকদ্দামার আর

ভাবনা নেই, বিষয় আশয় সব হাতে এসে পড়বে। তোর কি বাছা তাহলে এই সামান্য চাকরী নিয়ে থাকতে হবে ?

জীবন। না না, তুমি যেন ঐ সব ভেবে এখন থেকে কথা দিয়ে বসো না।

মা। আচ্ছা বাবা তারা যে এত করে পড়েছে তা কি বলব তুই-ই বল ? তারা যদি না থাকত ত এতদিন কোথায় দাঁড়াতুম ভাব দেখি।

জী। তাত সত্যি। কিন্তু আমি বিয়ে করব ভেবে ত আর তাঁরা এত করেন নি। বলবে এই যে, এখন হবার যো নেই।

মা। তাত বলেছি, কিন্তু তারা রাখতে রাজি।

জী। না না রাখার আবশ্যক নেই—বলো আমি কোথায় যাই—কোথায় থাকি—

মা। সে আবার কি কথা ?

জী। সে কিছুই না—চাকরী করতে গেলে কি এক জায়গায় থাকা ঘটে ?

মা। এক কথা কত বলব বাছা, বিয়ে হলে চাকরী করতে হবে না, চারুর মা বলেছে মকদ্দামা করবে।

জীবন হাসিয়া বলিল, "তা তুমি বলনা কেন, বিয়ের আবশ্যক কি ? অমনিই যদি মকদ্দামার খরচটা দেন ত বড়ই উপকার হয়, তার পর আমি সব শোধ করব।"

জীবনের মা রাগিয়া গেলেন, বলিলেন "আমি পারব না, তুই বলতে পারিস বলিস ; তারা মেয়ে দিতে সাধছে আমাদের ভাগ্যি !"

জীবন স্নেহলতাকে দেখিয়াছিল এবং তাহাকেই জগৎ বাবুর মেয়ে ভাবিয়াছিল—সুতরাং মায়ের কথাটা মনে মনে অস্বীকার করিতে পারিল না—কিন্তু হাসিয়া বলিল—"কেন মা, তোমার ছেলের কি কিছু গুণ নেই - যাতে লোকে মেয়ে দিতে ভাগ্যি ভাবে ?"

জীবনের মার রাগ পড়িয়া গেল, বলিলেন "তাই বুঝি এত গুমর ! না বাছা, লক্ষ্মী ছেলে, বল, বিয়ে করবি।"—

জীবন। না মা আমি এখন কিছু বলতে পারিনে।

মা। তবে কখন বলবি ?

জীবন। আরো ত দুবছর যাক।

জীবন ভাবিল আপাততঃ এই বলাই সুবিধা, অনেক অনুরোধ কান্নাকাটির হাত হইতে বাঁচা যায়।

জীবনের মা ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন, জীবন কখনো এরূপ ঠাণ্ডা হইয়া পূর্ব্বে বিবাহের কথা শোনে নাই, সুতরাং তাঁহারও মনে ইহাতে আশা হইল, ভাবিলেন জীবন অর্দ্ধ-সম্মত, ক্রমে ক্রমে তাহাকে রাজি করিতে পারিবেন, বেশী কিছু করিতে গেলে সব গোল হইয়া পড়িবে।

এদিকে গৃহিণী ঘন ঘন তত্ত্ব করিতে লাগিলেন, বর কন্যার মাতায় মাতায় বেশ এক রকম বোঝাবোঝি হইয়া গেল, জীবন যাহাই বলুক তাঁহারা জানিয়া রাখিলেন—এ বিবাহ হইবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। চারু এখন ষোড়শ বর্ষীয় বালক। কিন্তু সে আর আপনাকে বালক মনে করে না। যে চারু দুই বৎসর পূর্ব্বে পিতার মার খাইয়া কাঁদিয়াছিল সে চারুকে এ চারু এখন নিতান্তই স্নেহ দৃষ্টিতে দেখে! সে ঘটনা মনে করিতেও এখন তাহার ভারি হাসি পায়, লজ্জাও করে। দুই বৎসরের মধ্যে চারু আপনার নিকট এমনি একটা মান্যগণ্য মস্ত লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। না হইবেই বা কেন, সে এখন এণ্ট্রেন্স ক্লাশে পড়ে—কত বয়োজ্যেষ্ঠ বালক তাহার সমপাঠী, কত উচ্চ ক্লাশের বিদ্যাবুদ্ধিমান ছাত্রের সহিত তাহার আলাপ—ইহার উপর আবার গুপ্তসভার সে একজন মেম্বর। কত ছাত্র এই মহামান্য পদ লাভের প্রত্যাশী হইয়াও নিরাশ—কিন্তু চারু বিনা প্রয়াসে অযাচিত ভাবে এই সভ্যপদ লাভ করিয়াছে। সূর্য্যকিরণ মেঘে আচ্ছন্ন থাকিবার নহে, চারুর যোগ্যতা চারুকে স্বতঃপ্রকাশ করিয়াছে!

চারুর প্রতিষ্ঠার কারণ এই—একদিন তাহার একজন সমপাঠী তাহার পকেটে পেন্সিল খুঁজিতে গিয়া এক টুকরা কাগজ লাভ করিয়াছিল—কাগজখানি আর কিছু নহে একটি কবিতা। সমপাঠী ছুটির ঘন্টার সময় সমস্ত বালকদের সমক্ষে মহা রহস্যে যখন পড়িল—

এমনি চাঁদিনী নিশি
পুলক-কম্পিত দিশি ;
এমনি বিজন উপবনে,
মুখেতে চাঁদের আলো—
দীপ্ত আঁখি তারা কালো,
চেয়েছিল নয়নে নয়নে।

ছেলেদের মধ্যে তখন ভারী হাসির গর্‌রা পড়িয়া গেল। একজন বলিল,—"কে সে ?" আর একজন বলিল,—"যার কাল চোখ ?" তৃতীয় জন বলিল—"তাত জানি—কিন্তু কাল চোখ কার ?" সকলের কৌতূহল দৃষ্টি ও বিদ্রূপ প্রশ্নের মধ্যে চারু মৌন হইয়া রহিল, বাস্তবিক চারু কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এ কবিতা লেখে নাই—সুতরাং সে নিজেই জানিত না ইহার নায়িকা কে। সে ভাবিল কেন সত্যকার মানুষ লক্ষ্য না করিয়া কি কবিতা লেখা যায় না ? কবির কল্পনা তবে কি ? বিদ্রূপকারী বালকদিগের এই সামান্য কল্পনার অভাব দেখিয়া তাহার নিতান্তই ঘৃণা উপস্থিত হইল। এইরূপ চলিতেছে এমন সময় আর একজন ছাত্র এইখানে আগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ব্যাপার কি ?' সকলে বলিল—"আরে মশায়, আমাদের চারু বাবু কবি ! শুনবেন—এমনি চাঁদিনী নিশি পুলক কম্পিত দিশি"—

আর একজন বলিল—"দিশি, মশায়, বুড় মানুষের মত কাঁপে—হোহো—"

সকলে হাত তালি দিয়া হোহো করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। যাহার হাতে কাগজ ছিল তাহার পড়া বন্ধ হইল।

নবাগত ব্যক্তি তখন তাহার হাত হইতে কাগজখানি টানিয়া লইয়া নিজে পড়িতে আরম্ভ করিল, শেষ করিয়া বলিল, — "বাঃ বেশ ত হয়েছে—অতি সুন্দর।" চারুর আহ্লাদে মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিশোরীর মত সমজদার বুদ্ধিমান বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রশংসা পাইলে কাহার না আহ্লাদ হয়! এইখানে বলা আবশ্যক—কিশোরী এণ্ট্রেন্স ফেল হইবার পর দুইবৎসর আর পড়ে নাই, পিতার অনুরোধে বাধ্য হইয়া আবার সম্প্রতি এণ্ট্রেন্স ক্লাশে ভর্ত্তি হইয়াছে। কিশোরীর কথায় অন্য ছাত্রদিগেরও হঠাৎ সে কবিতা সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—সকলেই ইহার পর প্রশংসা দৃষ্টিতে চারুর দিকে চাহিল।

সেই হইতে কিশোরীর সঙ্গে চারুর বড় ভাব। কিশোরীকে কবিতা না শোনাইলে আর চারুর মন সুস্থ শান্ত না। কিশোরীর একটা বিশেষ গুণ অনুগত লোকের প্রতি তাহার বিশেষ কৃপা—সুতরাং সেও চারুকে বন্ধু জ্ঞান করে। কিশোরীই তাহাকে তাহাদের গুপ্ত সভার মেম্বর করিয়াছে—সেখানকার সে Poet Laureate.

আজ রবিবার। জগৎ বাবুর চন্দননগরের বাগানে উক্ত সভার অধিবেশন। বেলা দুইটা হইতে বাগানবাটির একতল গৃহের এক রুদ্ধ দ্বারের বহির্দেশে দুইজন ছাত্র দণ্ডায়মান। আশে পাশে গাছ পালা—এবং মাথায় গাড়ী বারান্দার আচ্ছাদন সত্ত্বেও প্রথম আশ্বিনের প্রখর রৌদ্রের ঝাঁজে তাহারা পুড়িয়া উঠিতেছে—তবুও তাহাদের পদ নিশ্চল। কিন্তু পা ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া তাহারা মন ধরিয়া

রাখিতে পারে নাই। মনের অধীরতায় তাহাদের দৃষ্টি ক্রমাগত একদিক হইতে অপর দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে আর বিরক্তিসূচক বাক্য গুলা অভিধান ঝাড়া করিয়া তুলিয়াও তাহাদের আশ মিটিতেছে না।

এইরূপে যখন তিনটা বাজিয়া গেল—তখন গেটের মধ্যে দুইজন লোক প্রবেশ করিল, ক্রমে তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাদের জন্যই উল্লিখিত ছাত্র দুইজন এতক্ষণ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। নবাগতদিগের সহিত দুই একটী কথা কহিবার পরেই উহারা তাহাদের চোখ বাঁধিয়া দ্বারে আঘাত করিল। দ্বার মুক্ত হইলে তাহাদিগের হাত ধরিয়া ছাত্র দুইজন যেমন ভিতরে প্রবেশ করিল—অমনি পুনর্ব্বার দ্বার বন্ধ হইল—আর সকলে সমস্বরে গাহিয়া উঠিল—

আজি হতে একসূত্রে গাঁথিনু জীবন
জীবন মরণে রব শপথ বন্ধন।

বহুকণ্ঠের সমস্বর গীতে রুদ্ধ গৃহ সহসা ঝটিকাতরঙ্গিত হইয়া উঠিল—অন্ধ নবাগত দুইজনের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কি না জানি ভয়ঙ্কর গোপনীয় ব্যাপার গৃহ মধ্যে চলিতেছে, কি না জানি অনিবার্য্য বিপদের মধ্যে তাহারা জীবন লইয়া আসিয়াছে? যদিও বিপরীত বাণীতেই আশ্বস্ত হইয়া ইহারা এ সভায় যোগদান করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু ভ্রান্ত-বিশ্বাসে নীত হইয়া বিদ্রোহীদের ফাঁদে পদার্পণ করিয়াছে বলিয়া এখন আর তাহাদের সংশয় রহিল না।

গান থামিবামাত্র সভাপতি নিকটবর্ত্তী হইয়া পদ্মবিদ্ধ

দুইখানি খড়্গ তাহাদের দুই জনের হস্তে অর্পণ করিয়া বলি-লেন—"এই পদ্ম ভারতের চিহ্ন স্বরূপ,—এই খড়্গ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার চিহ্ন স্বরূপ। ইহা ধারণ করিয়া শপথ কর—"

একসঙ্গে সুগম্ভীর স্বর উঠিল "ইহা ধারণ করিয়া শপথ কর—"

সভাপতি। শপথ কর, আজ হইতে তুমি ভারতের মঙ্গল কার্য্যে প্রাণপণ করিলে—আজ হইতে আমাদের সহিত ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইলে।

আবার সকলে। ইহা ধারণ করিয়া শপথ কর—

সভাপতি। শপথ কর, কোন কারণে সভা কর্ত্তৃক পরি-ত্যক্ত কিম্বা সভা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও ইহার কার্য্য কলাপ প্রকাশ করিবে না—আজিকার বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে না।

সকলে। জীবনে মরণে এই বিশ্বাস পালন করিবে? নবাগতগণ কি শুনিতেছিল কি বলিতেছিল যেন বুঝিল না কেবল কম্পিত কণ্ঠে তাহা আবৃত্তি করিয়া গেল মাত্র। তখন তাহাদের চক্ষুর বন্ধন উন্মোচিত হইল; এবং একে একে প্রত্যেক সভ্যগণ তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আর একবার সমস্বরে সকলে গান ধরিল—

এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন।
জীবন মরণে রব শপথ বন্ধন।
ভারত মাতার তরে সঁপিনু এ প্রাণ।
সাক্ষী পুণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান।

প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয় জয়।
সহায় আছেন ধর্ম্ম কারে আর ভয়।

ইহা চারুর রচনা—যখন সকলে এক সঙ্গে ইহা গাহিয়া উঠিল, তখন চারুর আপনাকে সেক্‌স্‌পিয়ারের সমকক্ষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গানান্তে সকলে পুনরুপবিষ্ট হইলে নূতন সভ্যগণ চারিদিক ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইল। চক্ষু বন্ধ অবস্থায় তাহারা যতখানি শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, দেখিল তাহার কোনই কারণ নাই।

গৃহে একখানি চতুষ্কোণ্ টেবিলের দুই প্রান্তে দুইটি মৃন্ময় ধুনাপাত্রে ধূপধূনা জ্বলিতেছে। মধ্যস্থলে পদ্মবিদ্ধ কতকগুলি খড়্গা। কাছে একটি দোয়াতদানির উপর কতকগুলি ফুলিস্কেপ কাগজ। ইহা ছাড়া টেবিলের উপর, সভাপতির চৌকির ঠিক সম্মুখে ধূনাচূর্ণে পরিপূর্ণ একটি কাচপাত্র রহিয়াছে; সভাপতি মাঝে মাঝে তাহা হইতে ধুনা লইয়া উভয় প্রান্তস্থিত প্রজ্জ্বলিত ধুনাপাত্রে নিক্ষেপ করিতেছেন। সভাপতির আশে পাশে অনেকগুলি চৌকি, সমস্ত গুলিতে লোক নাই, নবাগত দুইজন ছাড়া গৃহে ১৬ জন মাত্র লোক

সমবেত। তাহারা হিন্দুস্থানী পহলবান কিম্বা শিখ বিদ্রোহীও নহে—সমস্তই বাঙ্গালী ছাত্র। তাহাদের হাতে এক একখানা যে খড়্গা উঠিয়াছিল—তাহাও এখন টেবিলের উপর পড়িয়াছে। দেখিয়া নবাগতদিগের প্রাণটা যখন আশ্বস্ত হইল—তখন তাহারা নৈরাশ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে করিল, "দেশের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ, তাহার কিছু মাত্র আশা ভরসা নাই।'

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, বলিলেন—

"ভ্রাতৃগণ, আমরা এই পবিত্র ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যে মহৎব্রত গ্রহণ করিয়াছি, দেশ হিতকর অনুষ্ঠানে জাতিগত মাহাত্ম্য বৃদ্ধিই ইহার মূল সঙ্কল্প, দেশোন্নতিই ইহার চরম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃত উপায় কি? দেশে ধন বৃদ্ধি ও শিক্ষা বিস্তার!

প্রবাদ আছে লক্ষ্মী সরস্বতী দুই ভগিনী সপত্নী—ইহাদের একজনকে আরাধনা করিলে অন্যজন অপ্রসন্ন হন। কিন্তু আধুনিক অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত। যেখানে সরস্বতী সুপ্রসন্ন সেখানেই লক্ষ্মীর শ্রী। যেখানে লক্ষ্মীর কৃপা সেখানে সরস্বতীরও শুভদৃষ্টি। এত স্কুল কলেজের আড়ম্বরে, ভারতী দেবীর এত বন্দনাতেও যে তিনি আমাদের প্রতি পূর্ণ প্রসন্ন নহেন তাহার কারণ এখানে লক্ষ্মী দেবীর কৃপা দৃষ্টি নাই। এই দারিদ্র্যপীড়িত হতভাগ্য জাতির বিদ্যা চর্চ্চায় জীবন দানের অবসর কোথা? প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য বিদ্যালাভ নহে, ধনলাভ। কিন্তু এইরূপ অর্দ্ধ

শিক্ষায় এই উদ্দেশ্যই বা আমাদের কতদূর সাধিত হয় ? দেশের দিকে চাহিয়া দেখ—জীবন সংগ্রাম কি ভীষণ, কৃষক-দিগের অবস্থা মন্দ, শিল্পীদের অবস্থা মন্দ, বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটগণ অর্দ্ধ জীবন দানে সঞ্চিত উপাধির বিনিময়ে ৩০।৪০ টাকার চাকরীর জন্য লালায়িত ; কিন্তু ইহাও তাহা-দের অনেকের অদৃষ্টে দুর্ল্লভ, এই সহস্র সহস্র গ্র্যাজুয়েটকে স্থান দান করিতে গবর্ণমেণ্ট অক্ষম। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মধ্যেই হাহাকার। অথচ ইহার প্রতিবিধানের উপায় যাহা, সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। শিল্পের উন্নতি, দেশে বাণিজ্য বৃদ্ধি, ধন বৃদ্ধির প্রকৃত উপায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি যে দেশে শিল্পের যত উন্নতি সেই দেশই অধিক পরিমাণে ধনী। এককালে আমরাও শিল্পাগ্রগণ্য জাতি ছিলাম, ব্রিটিস রাজ্যের প্রারম্ভ পর্য্যন্তও ভারতবর্ষ নানাদেশে শিল্প রপ্তানি করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ভারতের শিল্প লুপ্ত প্রায়। দেশের শিল্প বিদেশে পাঠান দূরে থাক—আমরাই অধিকাংশ বিদেশীয় শিল্প ব্যবহার করি। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্রাদি হইতে সামান্য দেশলাইটি পর্য্যন্ত বিদে-শীয়। পাশ্চাত্য প্রদেশে বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে যতই কলকৌশলের বৃদ্ধি হইতেছে ততই হস্ত নির্ম্মিত প্রাচীন শিল্পের অনাদর হইতেছে। কেননা কলে অল্প সময়ের মধ্যে অল্প পরিশ্রমে বহু পরিমাণ দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাই কলের জিনিষ শস্তা। সুতরাং আমরা যদি শিল্পের উন্নতি চাই ত কলকৌশলের দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে। যেরূপ শিক্ষায় যেরূপ বিজ্ঞান চর্চ্চায় কলকৌশলের উন্নতি সম্ভাবনা সেইরূপ

শিক্ষা সেইরূপ বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইবে। কিন্তু যেরূপ শিক্ষায় আমাদের মনোবৃত্তি বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংগ্রামে তৎপর হইতে পারে তাহা আধুনিক পুঁথিগত শিক্ষা হইতে অনেক প্রভেদ। তাই বলিতেছি প্রাকৃতিক নিয়মের দুএকখানি পুস্তকে আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা শেষ করিয়া না ফেলিয়া ইউরোপের ন্যায় হাতে কলমে বিজ্ঞান চর্চ্চা এই সভার উদ্দেশ্য হউক।

আমাদের এই স্বর্ণশস্যশালিনী ভারতভূমি—কোন রত্নের এখানে অভাব? এখানে খনির অভাব নাই বাণিজ্য দ্রব্যাদির অভাব নাই, এখানকার লৌহাদি খনি হইতে ইউরোপীয়গণ ধাতু বাহির কবিতেছেন; এদেশের কার্পাস প্রভৃতি বিদেশে গিয়া সেখান হইতে বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ হইয়া আসিতেছে—আমাদের দেশের ধন রত্ন বুদ্ধির প্রভাবে অন্যের কবলজাত হইতেছে, আর আমরা নির্বুদ্ধি ক্ষুধিতগণ কাতর দৃষ্টিতে তাহাদের মুখপতিত উচ্ছিষ্ট রেণু-কণার জন্য হাত পাতিয়া রহিয়াছি।

গবর্ণমেণ্ট আমাদের এ সকল কাজে উদ্যোগী হইতে বারণ করেন না, তাঁহারা আমাদের শিল্পোন্নতি চাহেন এইরূপই বলিয়া থাকেন, সুতরাং এ স্থলে আমাদের অযোগ্যতাই এই নৈরাশ্যের কারণ। এই অযোগ্যতা দূর করিতে যদি আমরা একনিষ্ঠ হই—ত আজ না হউক কাল অবশ্যই আমরা কৃতকার্য্য হইব। একতা, দৃঢ়তা, সমবেত চেষ্টার অসাধ্য কি আছে! একতার দাঢ্য বর্দ্ধনের জন্যই আমাদের এই গুপ্ত সভা। বল যত অন্তর্বদ্ধ হয় কার্য্য করিবার ক্ষমতা

তাহার তত অধিক জন্মে। তাহা ছাড়া আরম্ভেই যাহাতে আমাদের এই উদ্দেশ্যের উপর অবিশ্বাসী-বিজ্ঞের হাস্যাস্ত্র প্রয়োগে ইহার অকাল বিনাশ প্রাপ্তি না হয়—সেই জন্যও আমাদের এই সাবধানতা। ইহা ব্যতীত এই সাবধানতার অন্য কোন গূঢ় কারণ নাই। অর্থাৎ আমরা বিদ্রোহী নহি—আমরা ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী নহি, তাহাদের অনুসরণকারী। ইংরাজ আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাহারা আমাদের অন্ধনয়ন ফুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে আমাদের নবজীবন বীজ অর্পণ করিয়াছে, তাহারা আমাদের নূতন সভ্যতা দেখাইয়াছে। আমরা সভ্য ছিলাম, কিন্তু আমরা উন্নতির প্রকৃত পথ অবলম্বন করি নাই, তাই উন্নতির অৰ্দ্ধ পথে আমরা নামিয়া পড়িয়াছিলাম। বাহ্য প্রকৃতির সহিত অন্তর প্রকৃতির সংগ্রামেই যথার্থ উন্নতি। ভারতবর্ষ এদিকে লক্ষ্য না দিয়া চিরকাল কেবলমাত্র মনোজগতেরচিন্তাকেই প্রাধান্য দিয়াছে, আমাদের সেই জন্য পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে নাই—যেমন শরীর ছাড়া মন নহে—শরীরের অবহেলায় মনের বিকাশ সম্ভব নহে, তেমনি বহির্জগত আমাদের অস্তিত্বেব সহিত এমনি জড়িত যে ইহার সংঘর্ষণ আমাদের জীবনের পক্ষে অনিবার্য্য, সেই জন্য কার্যাক্ষেত্রে নামিয়া ইহার ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতে প্রস্তুত না হইলে আমাদের প্রকৃত উন্নতির উপায় নাই—ইংরাজ ইহা আমাদের শিখাইয়াছে। সুতরাং এজন্য তাহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র, বিদ্বেষের নহে। তাহাদের কাছে আমরা অনেক সময় অন্যায় ব্যবহার পাইয়া থাকি সত্য, কিন্তু আমরা যদি মানুষ হইতে চাই তাহা

হইলে ইহাতে তাহাদের দোষ না দেখিয়া আমাদের নিজের যে দোষ আছে তাহাই দেখা উচিত, দেখিয়া তাহা নিরাকরণ করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। Might is right, ইহার অন্যথা কোথায়! অযোগ্য হইলে কে তাচ্ছিল্য না করে? যেখানে জুতা মারিলে জুতা খাইবার সম্ভাবনা নাই সেখানে কেনই বা তাহারা মারিবার সুখভোগ না করিবে? যোগ্যের জয় সর্ব্বত্র, যদি তাহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে চাও নিজে যোগ্য হও, কেবল গালিবর্ষণে যোগ্যতা জন্মে না। একতা! দৃঢ়তা! কার্য্যতৎপরতা! আমাদের এই লক্ষ্য যেন অভঙ্গ থাকে।"

চারিদিকের হাততালি ও বাহবা'র মধ্যে জীবন বসিল, নবীন উঠিয়া দাঁড়াইল, সকলে থামিলে আরম্ভ করিল—

"সভাপতি-ভ্রাতা যাহা বলিলেন তাহাতে বোঝায় এই, জোর যার মুলুক তার, এই বাক্যার্থের ভিত্তিমূলে যে সভ্যতা স্থাপিত তাহাই প্রকৃত সভ্যতা। পাশ্চাত্য সভ্যতার যে ইহা মূল মন্ত্র তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, যথার্থ উচ্চতর মহত্তর সভ্যতা এই বাক্যের অনেক উর্দ্ধে। যে সভ্যতার ন্যায়-নীতি সূর্য্যকিরণের ন্যায় সবল দুর্ব্বল নির্ব্বিভেদে স্বতঃপ্রকাশিত, যে সভ্যতার গৌরব—স্বার্থপরতার উপরে নহে—আত্মদানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত—সেই সভ্যতাই চরম আদর্শ সভ্যতা; অর্থাৎ বাহুবল নহে—আধ্যাত্মিক বলই প্রকৃত সভ্যতার বল।

ইংরাজ মহৎজাতি আমি অস্বীকার করি না—কিন্তু কেন?

তাহারা অসমর্থ অক্ষম ভারতবাসীদিগের প্রতি নির্যাতনে পারক বলিয়া? না বিদ্যা বুদ্ধিতে সমকক্ষ উপযুক্ত দেশীয়-কেও 'নেটীভ', বর্ব্বর বলিয়া ভ্রুকুঞ্চিত দৃষ্টিতে দেখে বলিয়া? ইহা তাহাদের মহত্ত্ব নহে—এইখানেই তাহাদের অনৌদার্য্য —কলঙ্ক। তাহারা মহৎজাতি—তাহাদের আত্মদানে, তাহা-দের উদার বিশ্বজনীন হৃদয় বিস্তারে। তাহাদের মধ্যে কত মহাত্মা পরের জন্য জীবন ত্যাগ করিতেছেন, সর্ব্বব্যাপী উদার নীতির পক্ষ গ্রহণ করিয়া অনুদার দেশের লোকের বিষময় ভ্রুকুটি অসঙ্কোচে সহ্য করিতেছেন, 'জোর যার মুলুক তার' ইহা যে প্রকৃত সভ্যতার মূল নহে—নিজের কার্য্য দৃষ্টান্তে তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

যোগ্যের জয়, ইহা সত্য। কিন্তু পাশব যোগ্যতা ও মানবিক যোগ্যতা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির উপর স্থাপিত। পাশব যোগ্যতার পরিচয় কোথায়—না পরের উচ্ছেদ সাধনে, আর মানবিক যোগ্যতার পরিচয় কোথায়—না আত্মদানে, ত্যাগ স্বীকারে। শেষের যোগ্যতা লাভ করাই যে যথার্থ উন্নতি যথার্থ সভ্যতার লক্ষ্য, ইহা কাহারো অস্বীকার করি-বার যো নাই। পৃথিবীর সকল পদার্থের ন্যায় সভ্যতারও উত্থান পতন আছে। রোম ইজিপ্ট ইহারা ত পদার্থগত সভ্যতার উচ্চ সোপানে উঠিয়াছিল—কিন্তু সে সভ্যজাতি এখন কোথায়? সুতরাং আমাদের সেই মহান্ সভ্যতারও যে আজ এই অধোগতি, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে আমার মতে সভাপতি-ভ্রাতা এই পতনের যে কারণ উল্লেখ করিলেন—তাহা ইহার প্রকৃত কারণ নহে। বহিঃপ্রকৃতি হইতে অন্তর্প্রকৃ-

তির উন্নতিকে তাঁহারা প্রাধান্য দিয়াছেন বলিয়া আমাদের সভ্যতা যে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই তাহা নহে। আধ্যাত্মিকতার উপর স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই সেই পুরাতন সভ্যতার মাহাত্ম্য, এবং আধ্যাত্মিকতার অবনতিতেই সে সভ্যতার পতন, তাহার পরাজয়। 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতি যখনি উল্লিখিত উদার ন্যায় নীতির স্থল গ্রহণ করিয়াছে তখন হইতেই ভারতবর্ষের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। যখন ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতার অপব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদের আত্মদান নিঃস্বার্থতার স্থলে স্বার্থসাধনই গূঢ় উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে তখনই আমাদের সভ্যতার মূল শিথিল হইয়াছে। তথাপি আমাদের সেই ভগ্ন সভ্যতা এখনো যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম—তাহা কিসের প্রভাবে? সেই আধ্যাত্মিক ভিত্তির দৃঢ়তার প্রভাবে। যাহা যত সারবান, যত যোগ্যতম তাহা কোন রূপে আপনাকে বর্ত্তমান রাখে। আমাদের পতন সত্ত্বেও যে আমরা বাঁচিয়া আছি, আবার উঠিতে আরম্ভ করিয়াছি—ইহাই আমাদের পূর্ব্ব সভ্যতার দৃঢ় ভিত্তিত্বের প্রমাণ। ইহাতে আমাদের লোপ নিবারণ করিয়া আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। সুতরাং আমাদিগের জাতিনিহিত সেই পুরাতন অবশিষ্ট আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ লাভে প্রয়াসী হইলেই আমরা যথার্থ লক্ষ্যে উপস্থিত হইতে পারিব! কেননা তাহা আমাদের নিজস্ব ধন, তাহাতে আমাদের পিতৃপুরুষাগত অধিকার। সে অধিকার আয়ত্ত করিবার আমাদের ক্ষমতা আছে। তাহা পুনর্লাভের পরিশ্রমে কুণ্ঠিত হইয়া

পরান্ন ভিক্ষায় ধনী হইব মনে করা ভ্রম। প্রকৃত পক্ষে বিদেশীয় ভাবের অনুকরণ আমাদের রক্তের পোষণকারী নহে। ইংরাজি শিক্ষায় কতক বিষয়ে আমাদের যেমন উপকার হইতেছে—তেমনি অনেক বিষয়ে অপকারও হইতেছে। ইংরাজ-অনুকরণে বাঙ্গালীর কিছু মাত্র কসুর নাই, বাঙ্গালী কথাবার্ত্তায় ইংরাজ, মতে বিশ্বাসে ইংরাজ, পরিধান পরিচ্ছদে ইংরাজ—খেলা ধুলায় আমোদ প্রমোদে ইংরাজ—কিন্তু তবু চরিত্রের সারবত্তায় বাঙ্গালী কতদূর ইংরাজ হইতে পারিয়াছে? কি করিয়া পারিবে! ইচোড় পাকিতে পারে তবু কাঁটাল হয় না। আমরা ইংরাজ হইব কিরূপে? তাহাদের সেই অটল কার্য্য-দক্ষতা, বাধাবিঘ্নের সহিত অবিশ্রাম যুদ্ধ করিবার উপযোগী শরীর মনের সেই তেজস্বী পাষাণ বল, আমাদের কোথায়? এই আলস্য সঞ্চারী নিস্তেজ জল বায়ুতে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই উদ্দাম উদ্যম কোথায় পাইব? সুতরাং অনুকরণ করিতে গিয়া তাহাদের মহত্ত্ব, সারত্ব, আমরা আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না, তাহার ভাণ মাত্র অনুকরণ করিতেছি, এবং এই ভাণের মধ্যে আমাদের নিজের খাঁটি জিনিষও অনেক হারাইয়া ফেলিতেছি। তাহাদের মত বিশাল ন্যায়প্রেম-সংগ্রামে আমরা প্রাণ দিতে অক্ষম, কিন্তু তাহার আড়ম্বরে আমাদের পুরাতন সংস্কারসিদ্ধ সর্ব্ব-জাতি-আদর্শ প্রতিবাসি-স্নেহ, পারিবারিক বন্ধন, সহজ করুণাভাব আমাদের মন হইতে চলিয়া যাইতেছে। অবিশ্রাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে জ্ঞান, বিশ্বাসকে নিয়মিত করিবার আমা

দের ক্ষমতা নাই—কিন্তু তাহার ভাণে আমাদের সরল ধর্ম্ম বিশ্বাস কেবল শিথিল হইয়া পড়িতেছে। আমাদের অন্তর্নিহিত জাতীয় সদ্‌গুণ, জাতীয় মহৎ ভাব—যেমন সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, বিনয়, ভদ্রতা প্রভৃতি যাহাতে আমরা ইয়োরোপীয় জাতিদিগেরও আদর্শ তাহার প্রতি পর্য্যন্ত আমাদের অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে, কেননা ইংরাজের নিকট আমাদের এ সকল গুণের সম্মান নাই। খৃষ্টের যদিও উপদেশ এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল ফিরাইয়া দিবে—কিন্তু বিপুলশরীর, প্রবল পশুতেজাভিমানী ইংরাজের মনের ভাব ইহা নহে—মুখের কথা মাত্র, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে বিনীতভাব ও সহিষ্ণুতার মর্য্যাদা তাহারা ধারণা করিতে পারে না, ইহা তাহারা কাপুরুষের ধর্ম্ম মনে করে —তাই অপমানিত হইয়া অপমান ফিরাইয়া দিতে না পারিলে তাহাদের 'অনার' যায়। আমরাও নিজের 'অনার' হারাইয়া পরের মিথ্যা অনারের ধুয়া ধরিয়াছি। পশুবল-প্রয়োগ হীনকর্ম্ম জ্ঞান না করিয়া,—আত্মসংযমে মনুষ্যত্ব জ্ঞান না করিয়া জুতার বদলে 'জুতা' বলিয়া চীৎকার করিতেছি। ইহাতে আমাদের মারিবার শক্তি জন্মিতেছে না—কেবল দাম্ভিকতা জন্মিতেছে—আর কাপুরুষতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

সুতরাং আমি বলি—কেবল বিজ্ঞান চর্চ্চা নহে— আধ্যাত্মিক উন্নতি ও জাতীয়তা রক্ষা এ সভার আর এক উদ্দেশ্য হউক!"

এবার দ্বিগুণ জোরে হাততালি পড়িল—বাহবা উঠিল। কিশোরী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিল—সকলে

শান্ত হইলেও তাহার উচ্ছ্বাস শমিত হইল না, সে বলিল—"Bravo! জাতীয়তা, জাতীয়তা! আমরা ধুতি পরিব, আসনে বসিব—বিজাতীয় স্পর্শ করিব না—আমরা strict হিন্দুভাবে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিব।"

জীবন বলিল—"কিশোরি একটু শান্ত হও। তুমি যাহা বলিতেছ তাহাতে জাত রক্ষা হইতে পারে—কিন্তু জাতি রক্ষা হইবে না। বাস্তবিক জাতির কুসংস্কার রক্ষা করা জাতীয়তা রক্ষা নহে—কেননা তাহাতে জাতির উন্নতি হয় না—জাতিগত চরিত্র মাহাত্ম্য রক্ষাই যথার্থ জাতিরক্ষা। আমার বিশ্বাস নবীন ভ্রাতা সেই অর্থেই জাতীয়তা ব্যবহার করিয়াছেন! সুতরাং আমাদের আধ্যাত্মিকতা—ধর্ম্মভাব যাহা আছে তাহার চর্চ্চা করা আমাদের কর্ত্তব্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহাকে যদি আবার বাহ্যিক আচারের আটে ঘাটে বাঁধিতে চাও তাহা হইলে সুফল হইবে না। আচারবন্ধন, জাতিবন্ধন আমাদের দেশে কি ভয়ানক বিষময় ফল প্রসব করিয়াছে! যে বীভৎস প্রথায় মানুষকে মানুষের ঘৃণ্য অস্পৃশ্য করিয়া তুলিয়াছে সেই অনুদার ঘৃণ্য প্রথার উপেক্ষা দ্বারা—তাহাকে ছিন্ন করিতে পারিলেই জাতির উন্নতি—সুতরাং যে নিয়মে এই হীন জাতীয়তা বর্দ্ধিত করে তাহা এ সভার পালনীয় হইতে পারে না।"

জীবন আরো কতক্ষণ বলিত জানি না—কিন্তু হঠাৎ পাঁচটার ঘণ্টা ঠংঠং করিয়া বাজিয়া উঠিল—সভ্যবর্গের মনোযোগ সেইদিকে আকৃষ্ট হইল, জীবনও এইখানে থামিয়া পড়িল।

কিশোরী বলিল—"সময় চলিয়া যায় আমাদের এখনি যাইতে হইবে, কিন্তু নূতন সভ্যগণের সহিত ত কিছু বন্দবস্ত হইল না।"

নবাগত দুইজন কিশোরী কর্ত্তৃক এখানে আনীত হইয়াছে। ইহারা নাকি কিছু দিন ধরিয়া পরীক্ষা দ্বারা গ্লাস প্রস্তুত, সাবান প্রস্তুত কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে, অর্থাভাবে কেবল প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে নাই। এই সভাও হাতে কলমে বিজ্ঞান চর্চ্চা চাহে—কল কারখানায় ভারতের ধন বৃদ্ধি করিতে চাহে, সুতরাং ইহাদের পাইয়া তাহাদের মহানন্দ।

নবীন বলিল—"মহাশয় আপনারা যে সাবান প্রস্তুত করিয়াছেন—তাহা কি দেখিতে পাওয়া যায় ?"

গ্লাস প্রস্তুত সাবান হইতে অধিক অর্থ সাপেক্ষ সুতরাং সভা আগে সাবানে হাত দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত ভাবিয়াছে।

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—"আমরা টাকার অভাবে একবারে সাবান প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারি নাই, সমস্তই আয়োজন হইয়া শেষে টাকার জন্য বাধিয়া গেল।"

জীবন জিজ্ঞাসা করিল—"small scale-এ আরম্ভ করিতে কত খরচ হইবে ?"

সে বলিল—"৫০০ টাকার কম একটা কারখানা আরম্ভ হয় না।"

সভ্যগণ সকলে সকলের মুখের দিকে চাহিল—এইখানেই গোলযোগ, সকলেই প্রায় স্কুলের ছাত্র এবং গৃহস্থ ঘরের ছেলে। পুঁজির মধ্যে দুইচার পয়সা করিয়া নিয়মিত

দৈনিক জল খাবারের পয়সা। যদি মূলধন বিশ পঞ্চাশ টাকা হইলে চলিত ত না হয় প্রত্যেকে ২।৩ টাকা করিয়া দিতে পারিত। মাস খানেক না হয় জলখাবার নাই খাইত। দেশের জন্য ততখানি তাহারা করিতে পারে—কিন্তু পাঁচ পাঁচ শ টাকা কে দিবে? তবে যদি জীবন বাবু চারু আর কিশোরী দেন? জীবন বাবু চাকুরে মানুষ—কিশোরী ও চারু বড় মানুষের ছেলে। সকলে আগ্রহ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিল।

নবীন ফুটিয়া বলিল—"জীবন বাবু—পাঁচশ টাকা! তোমরাই তবে দাও। কিশোরী আছে,—চারু আছে,—তুমি চাকরী করিতেছ,—আমরা কাপড়খানা চোপড়খানা যাহা আছে বিক্রি করিতে রাজি আছি—আর জলখাবারের পয়সা গুলাও হাতে হাতে দিয়া ফেলিব।"

জীবন একটু হাসিল। তাহার পৈত্রিক ঘড়ি চেনটা এস্থলেও ভরসা; কিন্তু মা তাহাতে কিরূপ 'গণগণ' করিবেন তাহাই তাহার মনে পড়িল।

কিশোরী জীবনকে জিজ্ঞাসা করিল—' দাদা তুমি কত দিবে?"

জীবন বলিল—"আচ্ছা ১০০।"

চারু বলিল "আমিও ১০০ দিব কিশোরীদা কত দিবে?"

কিশোরীর যে টাকার বিশেষ সুবিধা তাহা নহে; খরচ অনেক আয় অতি সামান্য। কুঞ্জ বাবু ছেলেকে মাসে মাসে পাঁচ টাকা দিয়া নিশ্চিন্ত, তাহার অধিক এক পয়সা তিনি দিবার নন, চাহিতেও কিশোরী সাহস

করে না—মাঝে মাঝে জ্যেঠাইমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যা দুদশ টাকা অতিরিক্ত আদায় করে মাত্র। অথচ চারু, জীবন যখন ১০০ টাকা করিয়া দিতে চাহিল কোন লজ্জায় সে তাহার কম বলে! তাহা হইলে তাহাদের কাছে তাহাকে ছোট হইতে হয়। সুতরাং এ বিবেচনার সময় নহে। সে বলিল—"আমিও একশত দিব—কিন্তু আর দুই শ"?

নবীন বলিল—"আমরা সকলে মিলিয়া আর পঞ্চাশ দিতে পারি, এইত তিনশ পঞ্চাশ। ভ্রাতৃবর কার্ত্তিক-চন্দ্র আর একবার হিসাব করিয়া দেখদেখি এই টাকায় কি কাজটা আরম্ভ হয় না? কতক তৈরি হইলে তখন বিক্রি চলিবে—টাকাও হাতে আসিবে, কারখানাও চলিবে, আরম্ভটা বইত নয়?"

নূতন সভ্য কার্ত্তিকচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা গণেশচন্দ্রের সহিত আবার হিসাব কবিতে আরম্ভ করিলেন, শেষ হইলে বলি-লেন—"আর টাকা ৫০ হইলে এক রকম হইতে পারে—তা সেটা না হয় আমরা দেব, ইহাতেই অ রম্ভ করা যাক।"

সকলের মুখে আহ্লাদ প্রকাশ পাইল। স্থির হইল আগামী রবিবারে সকলে চাঁদার টাকা লইয়া আসিবেন

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ট্রেন চলিতেছিল, নবীন ও কিশোরী সেকেণ্ড ক্লাশের এক কামরায় বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া গল্প করিতে ছিল। সভ্যদলের সংখ্যা বিস্তর, স্নুতরাং এক কামরায় সকলের বসিবার স্নুবিধা হয় নাই।

৬টা বাজিয়া গিয়াছে। ম্লান গোধূলি বর্ণে চারিদিক আচ্ছন্ন। কিন্তু পশ্চিম আকাশ হইতে এখনো এমনতর একটা উজ্জ্বল আভা সেই গোধূলিকে চাকচিক্যময় করিয়া তুলিয়াছে যে বাহিরের দৃশ্য এখনো অন্ধকার হইয়া পড়ে নাই। পরিষ্কার মাঠ, শ্যামল ক্ষেত, কলার বন, আম কাঁটালের ঝোপ, পদ্ম পুকুর, পুকুর পাড়ে ভাঙ্গা বাড়ী, তাহার পাশে নূতন বাগান ইমারৎ—এ সকলের প্রভেদ এখনো লক্ষিত হইতেছে। নবীন ও কিশোরী উভয়ের মুখই জানালায়, নবীন গাহিতেছে—

দিনের আলো নিভে এলো,
তবু—মনের আলো চোখে জাগে।
নাইক হেথায়, দিবারাতি,
সদাই—জ্বলছে ভাতি অনুরাগে।

কিশোরী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"নবীনদা, ঐ যে পুকুরধারে ভাঙ্গা বাড়ী দেখছ—কাল আমি ঠিক ঐ রকম বাড়ি স্বপ্নে দেখেছি।"

নবীন গান ছাড়িয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"সত্যি?"

কিশোরি। ঠিক বলছি ভাই, হুবহু ঐ বাড়ি! মানেটা কি বলদেখি?

নবীন। তুই আগের রবিবারে ঐ বাড়ীটা দেখে থাকবি।

কিশোরী। না ভাই আমি বেশ বলতে পারি আমি আগে ঐ ভাঙ্গা বাড়ী নোটিসই করিনি।

নবীন। নোটিস না করতে পারিস্—কিন্তু দেখেছিলি যে তার সন্দেহ নেই। ওটা হচ্ছে unconscious cerebration।

কিশোরী কথাটা ভাল করিয়া বুঝিল না—সেই জন্যই বিপক্ষে কিছু বলিতে সাহস করিল না—তাহা হইলে তাহার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। বলিল, "তা যেন হল—কিন্তু আমি যে স্বপ্ন দেখলুম—ঐ বাড়ীতে বসে খুব টাকা কুড়াচ্ছি সেটা কেন হলো?"

নবীন। টাকার ভাবনা ভেবে শুতে গিয়েছিলি আর কি—তাত আর কারো পক্ষে আশ্চর্য্য নয়।

কিশোরী। গা ছুঁয়ে বলছি—তা ভাবিনি। মনটায় তখন কি আমোদই হয়েছিল, ঘুমটা ভাঙ্গতে বড়ই দুঃখ হোল।

নবীন। আচ্ছা বল দেখি—একজন রোজ রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্নে খুব সুখী কিন্তু দিনে অসুখী, আর একজন দিনে সুখী কিন্তু স্বপ্নে অসুখী তাহলে তাদের দুই জনকে সমান সুখী বলা যায় কি না? এ একটা Psychologyর সমস্যা।

কিশোরী। তা কি করে হবে? তাহলে স্বপ্নটাকে সত্য বলে ধরে নিতে হয়—কিন্তু তাহলে স্বপ্ন বলছ কেন? এই খানেই ত তোমার কথার fallacy।

কথাটা বলিয়া কিশোরী মনে মনে গর্ব্ববোধ করিল।

নবীন। তা যদি বল তাহলে আমাদের জীবনটাই স্বপ্ন। ঐ যে দেখ্‌ছ বাড়ী ঘর গাছ পালা, তুমি ভাবছ প্রকৃত সত্য, কিন্তু আসলে ওরা কি—? কিছুই নয়। আমাদের কতকগুলা sensationএর সমষ্টি মাত্র। সাদা কথায় আমাদের মনের ভাব মাত্র।

কিশোরী। কিন্তু জিনিস সত্য না হলে আমাদের মনের ভাব জন্মাবে কোথা থেকে?

নবীন। Bravo! ডেকার্টেও উল্টারকমে ঐরূপ ভাবের কথাই বলেছেন। তিনি বলেন—আমি ভাবিতেছি অতএব আমি আছি, আমার অস্তিত্বের ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ।

কিশোরী। আর যখন আমি আছি তখন সকলেই আছে।

কিছু অগ্রে ট্রেন থামিয়াছিল—এই সময় একজন ইংরাজ এই কামরার দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। নবীন ও কিশোরী তাহাকে দেখিয়া দুই জনেই 'হ্যালো' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মিশনারী জন সাহেবও আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক How do you do বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। ইহার পর সকলে উপবিষ্ট হইলে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। ৬ এক কথার পর সাহেব কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি সে বইটি পড়িয়াছ?"

সাহেব অনেক বৎসর বাঙ্গালায় আছেন, বাঙ্গালী বালকদিগের সহিত তিনি বাঙ্গালাতেই কথাবার্ত্তা কহেন. বাঙ্গালীর মত বাঙ্গালা কহেন বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস।

কিশোরী বলিল—"না সাহেব, একজামিনের পড়া পড়িতেই ব্যস্ত তা অন্য বই পড়ার সময় পাই কখন ?"

সাহেব তখন নবীনের দিকে চাহিলেন।

নবীন বলিল—"পড়িয়াছি—ক্রাইষ্টের উপদেশ অতি সুন্দর

সাহেবের হৃদয় বড় আশাপূর্ণ হইয়া উঠিল, বলিলেন "ঈশ্বরের পুট্র ভিন্ন কে ওইরূপ কটা বলিটে পারে! আশা করি প্রভু টোমাকে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস দিয়াছেন ?"

নবীন। ঈশ্বরের পুত্র তিনি ইহাতে আমার অবিশ্বাস নাই—কেন না ঈশ্বরের পুত্র সকলেই।

জন। টেমন পুট্র নাই, প্রভু যীশু ও পরমেশ্বর একই,—টিনি পিটার অবতার আছেন।

নবীন। তাহা হইতে পারে। ঈশ্বরের ত অনেক অবতার জন্মিয়াছে।

কিশোরী। হ্যাঁ আমাদের শাস্ত্রেও তাহা পাওয়া যায়।

জন। তোমাদের শাষ্ট্র কিছু সট্য হয় না, মিট্যা বলিয়াছে—প্রভু যীশু একমাত্র অবটার আছেন।

কিশোরী। কেন সাহেব, আপনারি সত্য আর আমাদের মিথ্যা কেন ?

জন। আমাদের বাইবেল ঈশ্বরের মুখের কটা আছে। ঈশ্বরের বাক্য মিঠ্যা না আছে।

নবীন। এ কথা আপনারা বলিয়া থাকেন—কিন্তু আমরা মানিব কেন—প্রমাণ কি ?

জন। ভিন্ন ভিন্ন শিষ্য একবাক্যে এইরূপ বলিয়াছেন, কেমন করিয়া মিঠ্যা হয়। ইহার ঐটিহাসিক প্রমাণ আছে।

নবীন। অন্যান্য অবতারের সম্বন্ধেও ত ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে! তবে অন্যদের বেলায় সে প্রমাণ যে অগ্রাহ্য হবে আর যীশুর বেলাই গ্রাহ্য হবে তার তো কোন যুক্তি-যুক্ত কারণ পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া আপনাদের ঐতিহাসিক প্রমাণ যাহাই হউক বৈজ্ঞানিক প্রমাণে বাইবেলের সত্য মিথ্যা হইয়া যায়। Evolution Theory মানিতে হইলে আপনার বাইবেল মানা চলে না, কিন্তু আমাদের হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। আপনাদের বৈজ্ঞানিকেরা বলেন মানুষ যে যে অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে গর্ভাবস্থায় ভ্রূণ সেই সেই অবস্থা অতিক্রম করে—তাহার প্রথমকার প্রধান তিন অবস্থা মৎস্য, কচ্ছপ ও বরাহ। হিন্দু শাস্ত্রমতেও ভগবান মৎস্যরূপ হইতে কচ্ছপ রূপ তাহা হইতে বরাহ রূপ—এবং ক্রমে অন্যান্য রূপ অতিক্রম করিয়া মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছেন।

জন। Nonsense!

নবীন। ইহাকে যদি Nonsense বলেন ত সাহেব এরূপ ননসেন্স আপনাদের শাস্ত্রেই বা অভাব কি? তবে ননসেন্স হইতে নন টুকু ছাঁটিয়া সেন্স বাহির করিলেও আমাদের ধর্ম্ম বজায় থাকে, হিন্দুশাস্ত্রের অসারতা বাদ দিয়া যিনি সার বিশ্বাস করেন তিনিই প্রকৃত হিন্দু, কিন্তু আপনা-দের ধর্ম্মের ননসেন্স বিশ্বাস না করিতে পারিলে ধর্ম্মই মানা হয় না। কেহ যদি ক্রাইষ্টের 'মিরাক্ল্' অবিশ্বাস করেন—তাহা হইলে কি আর তিনি খ্রীষ্টান্?

জন। Oh! Lord save them! আমি সর্ব্বদাই তোমাদিগের জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

নবীন। সে জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

কিশোরী। মুক্তিলাভের আশা না রাখিয়াও, সাহেব!

জন। Oh! ye of little faith, বিশ্বাস কর, যীশু বলিয়াছেন, বিশ্বাসের বলে পর্ব্বত নাড়ান যায়।

নবীন। সাহেব একটি কথা বলি, খৃষ্টানদের উপদেশ এক, ব্যবহার আর, আমরা কি শিখিব বলুন দেখি? আপনাদের ধর্ম্মে বলে, গায়ের পিরান কাড়িয়া লইলে কোটটা পর্য্যন্ত দিয়া দিবে, কিন্তু আপনারা চ'খের বদলে চোথ, দাঁতের বদলে দাঁত, না নিয়া ছাড়েন না; আর আমরা বেচারারা এক গালে চড় খাইয়া আর এক গাল পাতিয়া দিই বলিয়া আপনারা আমাদের ঘৃণা করেন! এই ত আপনাদের উদারতা—আর brotherly feeling! আর এই জন্যই ত আমাদের নাম নিগার?"

জন সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "টুমি যাহা বলিটেছ খৃষ্টান লোকের উহা কর্ম্ম না আছে।"

কিশোরী। তবে সাহেব আঙ্গুলে গুণিয়া খৃষ্টান বাছিতে হয়।

তর্কটা আর চলিল না, ট্রেণ থামিয়া পড়িল, ষ্টেসনের জনতায়, গোলযোগে আকৃষ্ট হইয়া কিশোরী নবীন দুই জনে গাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইল। কিশোরী বলিল—"নবীনদা, ঐ দেখ জীবনদা মুখ বাড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কচ্ছে।"

জন সাহেব বলিলেন—"জীবন আসিয়াছে ?"

কিশোরী। হ্যাঁ, সাহেব ; ঐ পাশের গাড়ীতে।

সাহেব তাহার সঙ্গে দেখা করিতে নামিয়া গেলেন। দুই জন ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ, পিঠপিঠ এই গাড়ীর নিকটে আগমন করিল ; নবীনদের দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রী বিষময় কটাক্ষে একবার জীবন ও কিশোরীর দিকে চাহিয়া পুরুষ-সঙ্গীকে আস্তে আস্তে কি বলিল। পুরুষ স্পষ্ট স্বরে বলিল "অন্য গাড়ী সব পূর্ণ, এ গাড়ীতে না গেলে তোমাকে মহিলাদের গাড়ীতে যাইতে হয়।" (অবশ্য তাহাদের কথা-বার্ত্তা ইংরাজীতেই চলিতেছিল)। বোধ হয় স্ত্রী তাহাতে সম্মত হইলেন, কেননা তাহার পর উভয়ে এস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তাহারা চলিয়া গেলে নবীন বলিল—"জীবন কোথায় গেল, ইংরাজদের বিশ্বজনীন উদারতা দেখিত।"

কিশোরী। ভাই, মেয়েটা কি ঘৃণা-দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইলে! আমরা ঠিক যেন সাপ ব্যাং ? তবু ত নিজের ঐ চেহারা!

নবীন। আমার বিশ্বাস ইংরাজ মেয়েরা যদি এদেশে না আস্‌ত—তাহলে পুরুষদের সঙ্গে আমাদের ঢের বনে যেতো। অনেকে স্ত্রীদের ভয়ে কেবল আমাদের সঙ্গে মিশতে পারে না। অনেক ইংরাজ এ দেশকে যথার্থ নিজের দেশ করেছে, এ দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ করেছে, দেশী লোককে ভাইয়ের মত ভালবেসেছে, কিন্তু অ্যাংলো ইণ্ডি-য়ান মেয়েদের ত এ দেশের জন্য প্রাণ ঢেলে একটা কাজ করতে দেখিনে, আত্মভাবে একটা দেশের লোকের

সঙ্গে মিশতে দেখিনে, তাঁহাদের সূক্ষ্ম রুচি জ্ঞান, আর মান অপমান এত প্রখর যে 'নেটিভ' দেখ্‌লে তাঁহারা শিহরিয়া ওঠেন।

কিশোরী। কিন্তু ইয়ুরোপের মেয়েরা শুনেছি আমাদের বড়ই পছন্দ করে, তাদের চোখে আমাদের এ তামা রং-ও রূপার চেয়ে নাকি সুন্দর দেখায়। একজন ফ্রেঞ্চম্যান্‌ ওখাড়ীর ছোড়দাদাকে নাকি বলেছিল—তোমার মত যদি আমার রং হোত তাহলে আমি মেয়ে মহলের প্রশংসা একচেটে করে ফেল্‌তুম।

নবীন। তবে দেখছি একবার যেতে হোল। এ দেশের মেয়েরা ত নিদেন সেরূপ কোন ভাবের পরিচয় দেয় না, তবু এত করে পিয়ার্স সোপ মাখছি!।

ট্রেণের শেষ ঘণ্টা পড়িল, দ্রুতগতিতে দ্বার ঠেলিয়া একজন ইংরাজ এই কামরায় উঠিয়া পড়িল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে তিনি অন্য বেঞ্চে বসিয়া একখান খবরের কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পড়িতে পড়িতে ক্রমে নবীনের বেঞ্চে পা তুলিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ নিতান্তই নির্দ্দোষ ভাবে। কিন্তু নবীন ভুল বুঝিল, ইহাতে মন্দ অভিপ্রায় অর্পণ করিয়া নিজেও প্রতিশোধ স্বরূপ তাহার বেঞ্চে পা তুলিয়া দিল। এতক্ষণ সাহেবের দৃষ্টি কাগজে ছিল এইবার তাহার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন "Will you go to the other bench—there is plenty of room there!"

নবীন বলিল—"you can do it yourself if you like.

সাহেব গোসা হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"You must."

নবীন। Why *must*?

সাহেব দাঁড়াইয়া বলিলেন—"How dare you!" এই কথা বলিয়াই কামিজের আস্তেন গুটাইতে আরম্ভ করিলেন।

নবীন তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করিল না। সাহেব উঠিয়া খাড়া দাঁড়াইতেই সেও অমনি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সাহেবের অনুকরণে আস্তেন গুটাইতে আরম্ভ করিল। কিশোরী ভয় পাইয়া বলিল "নবীনদা, আর না, এদিকে এস। একটা গোল বাধাবে শেষে! এখানে আমাদের ধরে মারলে কোনই উপায় নাই।"

কিন্তু নবীনের সাহস দেখিয়া সাহেব একটু থমকিয়া গেল—মারিবে কি না ভাবিয়া পাইল না।

কিশোরী বলিল "Beg your pardon, sir! Do'nt mind him."

সাহেবের তখন হাত শিথিল হইয়া আসিয়াছে, গাড়ীও ষ্টেশনে আসিয়া থামিয়াছে। পাদ্রি সাহেব কামরায় পুনঃ প্রবেশ করিলেন—নবীন, কিশোরীর সহিত তিনি বিদায় লইতে আসিলেন। এখানে সকলের অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?"

নবীন হাসিয়া বলিল—"আপনাদের সভ্যতা আমাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল—নহিলে বোঝে না সাহেব," বলিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিল।

পাদ্রি সেই সাহেবকে বলিলেন, "It's shameful!

You ought to apologise to this young gentleman."

সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"I would rather apologise to a piece of stone than to a nigger!" বলিয়া, সাহস এবং ভদ্রতার চূড়ান্ত আদর্শ দেখাইয়া ক্রোধভরে ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কিশোরী বিকালে বেড়াইতে গিয়াছিল, সন্ধ্যা না হইতে হইতে বাড়ী ফিরিয়া তাহার পাঠ-গৃহের কৌচের উপর ধুম করিয়া শুইয়া পড়িয়া ডাকিল "হরে"! কিন্তু কলিযুগ কিছু উল্‌টায় নাই যে, বাঙ্গাল ঘরের চাকর এক ডাকেই অমনি উত্তর দিবে। যতক্ষণ ডাকের উপর ডাক না পড়িল, হাঁকের উপর হাঁক না চড়িল, ততক্ষণ ভৃত্যবাবু উত্তর দেওয়াটা আবশ্যকই বিবেচনা করিলেন না, অবশেষে নিতান্তই বাড়াবাড়ি দেখিয়া মোটা গলায় পূর্ব্ব বাঙ্গালা স্বরে গলা হাঁকিলেন, "এজ্ঞে!"—এবং সঙ্গে সঙ্গে নারিকেল তেলের এক সেজ-বাতি হস্তে স্বয়ং গৃহে প্রবেশ করিয়া আর একবার বলিলেন, "এজ্ঞে, ডাহিলেন?"

কিশোরীর মেজাজ তখন অত্যন্ত চড়িয়া উঠিয়াছে। মুখভঙ্গী করিয়া সে ভৃত্যের অনুকরণে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—" 'এজ্ঞে ডাহিলেন!' এতক্ষণ কোথায় ছিলি? বাবুর সাড়াই নেই!"

ভৃত্য নিষ্পরোয়াভাবে টেবিলে বাতি রাখিয়া বলিল, "এই বাতিটা আন্‌তেছিলাম।"

কিশোরী। যা, বাড়ীভিতর থেকে আমার খাবার আন। আজ আর সেখানে খেতে যাব না।"

"এজ্ঞে, তা আনছি" বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। কিশোরী ডেস্ক খুলিয়া, যাহা খুঁজিতেছিল তাহা না পাইয়া ডেস্কের ডালাটা দুম্ করিয়া ফেলিয়া বিরক্ত হইয়া চৌকিতে বসিয়া পড়িল। ভৃত্য লুচির থালা ও জলের গেলাস লইয়া ঘরে ঢুকিতেই কিশোরী উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—"কই আমার সেণ্টটা কোথা?"

ভৃত্য হাতের জিনিস টেবিলে রাখিয়া প্রশান্তভাবে বলিল,—"দোকানদার আর 'দারে' দিল না—বল্লে ৬৫৲ টাকা তিন আনা তিন পয়সা দাদাবাবুর নামে দার— এ টাকা দু এক দিনের মধ্যে না পালিই বাবুকে জানাবে।"

কিশোরী। ৬৫৲ টাকা ধার!—কিসে?

ভৃত্য। রেসমের রুমলই কত আনেছি—হরেক রকম শিশিই বা কত আনেছি—অডিকলমের ত নিকাশ নাই—হিসাবটা একবার দেখুন্ না কেনে, বাবু।

ভৃত্য ট্যাঁক হইতে একখানা কাগজ খুলিয়া কিশোরীর হাতে দিতে গেল, কিশোরী বলিল, "ও থাক্ এখন! পরে দেখ্‌ব—৬৫৲ টাকা! আচ্ছা দু তিন মাসের মধ্যে আমি দিয়ে ফেল্‌ব! দোকানদারকে একটু বুঝিয়ে বলিস্— বুঝ্‌লি?

ভৃত্য। তা বল্‌ব, কিন্তু আপনকার ছ মাসের ত আবার খরচ চলা চাই!

কিশোরী। সে তোর ভাবতে হবে না, আপাততঃ এই ছ' আনা নিয়ে একটা সেণ্ট কিনে আন, বুঝ্‌লি, আমার বাইরে যেতে হবে।

ভৃত্য পয়সা লইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু অল্প দূর গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"দাদাবাবু, জীবনদাদা বাবু আস্‌তেছেন!"

কিশোরী। জীবনদা? তা তুই অডিকলমটা এনে আস্তে আস্তে ডেস্কের মধ্যে রাখিস্—বুঝ্‌লি?

কিশোরী গৃহের বাহিরের বারান্দায় আসিতেই জীবনকে দেখিতে পাইল, তাহাকে আসিতে দেখিয়া সে সত্যই বড় আশ্চর্য্য হইল, তাহার পিতা জীবনকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত জীবন আর কখনো এ বাড়ীতে আসে নাই।

কিশোরী বলিল—"এস, জীবনদা, ঘরে এস! সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ যে?"

জীবন বলিল—"একটা কাজের কথা আছে।"

কিশোরী আরো আশ্চর্য্য হইল। দুজনে গৃহে প্রবেশ করিলে জীবন বলিল—"আমার আজই নটার ট্রেণে পশ্চিম যেতে হবে, যে ১০০৲ টাকা এই রবিবারে সভায় দেবার কথা আছে, তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি তুমি দিও এর জন্যই আমার আসা।"

কিশোরী বলিল—"হঠাৎ পশ্চিম যাচ্ছ যে?"

জীবন বলিল—"বেশী কথার সময় নেই, আমার এখনি যেতে হবে, ফিরে এসে সে সব বলব।"

এই বলিয়া জীবন ১০০৲ টাকার নোট কিশোরীকে দিয়া চট্‌পট্‌ চলিয়া গেল।

আসল কথা মোহন রুড়কিতে পীড়িত, তাই জীবন সেখানে যাইতেছে। জগৎবাবুর নিকটই টেলিগ্রাফে এ খবর আসে। কিন্তু কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া তাঁহার সেখানে যাইবার সুবিধা না হওয়ায় জীবনের নিকট তাঁহার এ কথা প্রকাশ করিতে হইয়াছে। এবার প্রথম আশ্বিনেই পূজা গিয়াছে, সুতরাং এখনো স্কুল কলেজ বন্ধ, এ সময় পশ্চিম যাইতে জীবনের কিছুমাত্র অসুবিধা নাই। জীবনকে ব্যতীত আর একজনকে মাত্র জগৎ বাবু এ কথা বলিয়াছেন। কুঞ্জবাবু মোহনের পীড়ার কথা শুনিয়া প্রথমটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন—তাহার পর বেহাইকে বলিলেন—"তোমরা তার আপনার লোক, তোমাদের কাছে খবর এসেছে—তোমরা তদ্বির কর, আমি আর কি করব।" কিন্তু জগৎবাবু চলিয়া গেলে কুঞ্জবাবু বুড় সরকারকে ডাকিয়া সেই দিনই তাহাকে পশ্চিমে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন, এবং যে কয়দিন পর্য্যন্ত তাহার আরোগ্য সংবাদ না পাইলেন সে কয়দিন ঘর হইতে বাহির হইলেন না। কিন্তু এ খবব কিছু আর জীবন জানিত না – তিনি যে জগৎ বাবুকে কড়া কথা বলিয়া বিদায় করিয়াছেন তাহাই মাত্র সে শুনিয়াছিল। সুতরাং এরূপ স্থলে কিশোরীকে মোহনের পীড়ার সংবাদ দিয়া তাহাকে কেবল বৃথা ভাবনায় ফেলিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

জীবন চলিয়া গেল, কিছু পরেই ভৃত্য গৃহে প্রবেশ করিয়া কিশোরীর হস্তে অডিকলমের শিশি দিয়া বলিল—"এই

আনিছি। কিন্তু বড় ভাবনা ধরায়েছে, দোকানদার পাজি কিছুতেই রাজি হয় না, বলে আজ কাল টাকা না পালেই সে বাবুমশয়কে জানাবে,—আমি কত সমজালাম কিছুতেই কথা মানে না—বলে, বাবু যদি না টাকা দেন ত নালিস করবে।"

কিশোরী পকেটে হাত দিয়া বলিল—"পাজি ছোটলোক, খবরদার তুই তাকে আর খোসামোদ করিসনে, এই নে তাঁর টাকা আজই চুকিয়ে দে, রসিদ না নিয়ে যেন দিস্‌নে।"

কিশোরী ১০০৲ টাকার নোট হইতে ৭০৲ টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল,—"এই নে, ৬৫৲ টাকা তাকে দিয়ে বাকীটা তোর কাছে রাখিস।"

ভৃত্য। পঁয়ছটি্ট টাকা তিন আনা তিন পয়সা।

কিশোরী। আচ্ছা তাই।

ভৃত্য। কি জানি শেষে আমারে তুষ্‌বেন—কবেন, তিন আনা তিন পয়সা আমার কোথায় গেল—তাই আগে থাকতে বলে রাখ্‌তেছি!

চাকর চলিয়া গেল—তাহার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, অত টাকা বাবু হঠাৎ কোথায় পাইলেন! অন্য কোন কারণ না পাইয়া অবশেষে স্থির করিল বাবু জ্যেঠাইমা-মাগীর ঘাড় ভাঙ্গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের ন্যায় সহজ সিদ্ধান্ত। সমস্যা ভঙ্গ হইয়া গেলে তখন যেন আনন্দ করিবার অবকাশ পাইল। ভাবিল "মাগী হাত তুলে ডু্ তু পয়সা কাউকে দেয় না, এমনি করে না নিলেই বা চলে কই! চাকরি করতে এসেছি দু পয়সা ত নিতে হবে। এত করে নইলে খাওয়াতে শেখা-

ঘুমই বা কেন ? এতে এখনো ছুপয়সা পাব বড় হলেও ছুপয়সা পাব—এ রকম নইলে ত বড় মানুষের হাত উঠে না !"

চাকর কাজ উদ্ধার করিয়া চলিয়া গেল, মনিব কাজ উদ্ধারের চেষ্টায় তখন জ্যেঠাইমার কাছে বাড়ী ভিতর গেলেন। জ্যেঠাইমা তখনো বারান্দায় বসিয়া হরিনামের মালা জপিতেছিলেন—কিশোরীকে দেখিয়া বলিলেন—

"কিশোর নাকি ? বাবা, দুদিন বিকালে খেতে আসিস্‌নে কেন রে ?"

কিশোরী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "জ্যেঠাইমা, পূজার পার্ব্বনী ?"

জ্যেঠাইমা বলিলেন—"এই সে দিন কেড়ে কুড়ে যা দশ-টাকা হাতে ছিল নিয়ে গেলি, আবার কোথা পাব ? থাক্‌লে ত তোরি সব।"

কি। না, জ্যেঠাইমা, আমি ওসব কথা শুন্‌ব না, আমায় কলেজের ছেলেরা খাওয়াতে ধরেছে।

জ্যে। কেন, তোর বাপ যে সেদিন ঐ জন্যে ১০৲ টাকা দিলে ?

কি। হ্যাঁ, ১০৲ টাকাতে ত সবই হয় ? এ ত আর তোমাদের সেকেলে চিঁড়ে মুড়কির ফলার নয়—বাবা ত আর তা বোঝেন না !

জ্যে। তা তোর বাবাকে বলগে। আমি গরীব মানুষ আমি কোথায় পাব—হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ।

কি। সে কথা আমি শুনব না—ওঠ, জ্যেঠাইমা, নইলে নিই—চাবি নিই ?—

জ্যেঠাইমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ছুঁসনে, আরে ছুঁসনে, মালা করা বন্ধ করিস নে।"

কিশোরী বলিল—"বাক্স খোল তবে—না হলে ছুঁয়ে দেবো।"

জ্যেঠাইমা শশব্যস্ত হইয়া খুঁটের চাবি বাঁ হাতে ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিনীত স্বরে বলিলেন "লক্ষ্মী বাবা, আমার কিছু নেই। টাকা কি আমার আছে! সে দিন ত তুই সব নিলি!"

কিশোরী। হরি নামের মালা হাতে করে মিথ্যা কথা! আছে কি না আছে, আচ্ছা দেখছি।

কিশোরী জোর করিয়া তাঁহার হাতের চাবি কাড়িয়া লইল, জ্যেঠাইমা চীৎকার করিতে লাগিলেন "এমন দস্যি ছেলেও দেখিনি—দাঁড়া, এক্ষণি ঠাকুরপোকে বলে দিচ্ছি—আমার আর এখানে থাকা হোল না।" সে চীৎকারে কে কর্ণপাত করে? তাহার প্রতি কোন লক্ষ্যই না করিয়া কিশোরী আলমারি খুলিল। আলমারিতে একটা কৌটার ভিতর যেখানে তাঁহার টাকা পয়সা থাকিত, তাহাতে কিছুই না পাইয়া বুঝিল জ্যেঠাইমা সেয়ানা হইয়াছেন। তখন আলমারির কাপড় চোপড় তোলপাড় করিয়া তাহার মধ্যে হইতে একটি বাক্স বাহির করিল। এতক্ষণ জ্যেঠাইমা একটু নিশ্চিন্ত ছিলেন—কিন্তু বাক্স দেখিয়া আবার চীৎকার আরম্ভ করিলেন, বলিলেন,—"লক্ষ্মী বাবা, নিসনে, আমার আর কিছু নেই, হাত খরচ চলবে না"—তিনি চীৎকার করিতে করিতে এদিকে কিশোরী বাক্স খুলিয়া ফেলিল।

কিন্তু এত কষ্টের পর দেখিল মোট ১০৲ টাকার একখানি নোট মাত্র তাহাতে রহিয়াছে। নিতান্ত অসন্তুষ্ট ভাবে সেই নোটখানি লইয়া বাক্সের ডালা ত্নম করিয়া ফেলিয়া বলিল—"হাত খরচের তোমার ভাবনা! বাজার খরচ ত তোমার হাতে। জ্যেঠাইমা, আমাকে আর কিছু না দিলে হবে না।"

জ্যেঠাইমা তখন ভারী রাগিয়া উঠিয়াছেন—বলিলেন 'সব নে, যা আছে সব নে, আমি এই ঠাকুরপোর কাছে বলতে চল্লুম।"

কিশোরী সে বিষয়ে বেশ নিশ্চিন্ত। মুখে যাহাই বলুন সে এইরূপ আবদার করে বলিয়াই তিনি তাহাকে বেশী ভাল বাসেন। কিশোরী বলিল—"তা, বাবা না হয় আমাকেও বাড়ী থেকে দাদার মত বিদায় করবেন!"

গৃহিণীর স্বর হঠাৎ কড়িমধ্যম হইতে কোমল নিখাদে নামিয়া পড়িল, বলিলেন—"হ্যাঁরে মোহানের খবর কিছু পেলি—ভাল আছে ত?"

কিশোরী। খবর আমি কি পাব—ডাক্তারবাড়ী খবর জিজ্ঞাসা করো।

জ্যে। তা তোর ত ডাক্তারের ছেলের সঙ্গে ভাব—কিছু শুনতে পাস্‌নে?

কি। হ্যাঁ, আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই আমি ঐ কথা তাকে জিজ্ঞাসা করি? দাদা আমাদের চিঠী লেখে না—এ অপমানের কথা তাদের জানাবার কি আবশ্যক?

বলিতে বলিতে চাবিটা তাঁহার পায়ের কাছে ফেলিয়া সে পিঠটান দিল।

কর্ত্রী হাঁকিলেন—"ও কিশোরী দিয়ে যা, লক্ষ্মী ছেলে আমার হাত খরচের কিছু নেই।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কিশোরী বড় ভাবনায় পড়িল। জ্যেঠাইমার কাছ হইতে টাকা লইয়া অন্ততঃ জীবনের টাকাটা পূরাইয়া রাখিতে পারিবে তাহার এইরূপ দৃঢ় আশা ছিল। নিরাশ হইয়া বড়ই দমিয়া গেল! পরদিন আর একবার জ্যেঠাই-মাকে ধরিয়া পড়িল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। জ্যেঠাই মা ঐ নোট খানি মাত্র হাতে রাখিয়া সমস্তই পিত্রা-লয়ে পাঠাইয়াছিলেন। তখন উপায়বিহীন হইয়া সে হরিকে মুরব্বি পাকড়াইল, "যদি সে কোন প্রকারে কাহারো নিকট হইতে তাহাকে ধার আনিয়া দিতে পারে।" হরি দেখিল বড় গোলের কথা, মনে মনে যাহা স্থির করিবার করিয়া মুখে বলিল—"তা বাবু চেষ্টা বেষ্টা করে দেখি—দরকার হলে সবি করতে হয়।" প্রভুভক্ত হরি আহা-রান্তে চাদর ছাতা লইয়া বাহিরে গেল—বাবু ভাবি-লেন এমন নেমকের চাকর আর নাই। তাহার অপেক্ষায় উৎসুক ভাবে পথের দিকে চাহিয়া সেদিন কিশোরীর দিন কাটিল। এদিকে সারাদিন দেশের লোকের কাছে কাটাইয়া সন্ধ্যাবেলা চাকরবাবু আসিয়া দেখা দিলেন.

কিশোরী ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইল?" ভৃত্য-বাবু উত্তর দিল—"মশায়—কত জায়গায় যে ঘুরলাম ঠিক নেই—জলতেষ্ঠায় প্রাণ টা টা করছে।"

কিশোরী। কিন্তু টাকা!

ভৃত্য। টাহা ত কেউ দেলে না, এমন পাজি লচ্ছার বেটারা যদি দেহেছি—কি বলব আমার হাতে টাপা নাই—দমফাটি মরচি।

কিশোরীর মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, একমাত্র আশায় নিরাশা! তাহার সেই নিরাশক্লান্ত মুখ দেখিয়া ভৃত্যেরও মমতা হইতে লাগিল। বলিল "বাবু মশায়, তা টাকা নিয়ে কি করবেন কি—কর্ত্তাকে চাইলে দেন না?" কিশোরী রাগিয়া বলিল—"যা এখান থেকে। উনি আবার অ্যাডভাইস দিতে এলেন!"

ভৃত্য আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। কিশোরী তাহার ডেস্ক খুলিয়া অডিকলমের শিশি মুখে তুলিল, অমৃত পান করিয়া কৌচে শয়ন করিল। কিছু পরেই জুতার শব্দ হইল—কিশোরী মুখ তুলিয়া দেখিল—কার্ত্তিক বাবু। শশব্যস্তে উঠিয়া বলিল—"এই যে মাষ্টার মশায়—বসতে আজ্ঞা হোক, কি খবর?"

কার্ত্তিকবাবু কিছুদিন কিশোরীকে পড়াইয়াছিলেন।

কার্ত্তিকবাবু আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"বলি এবারকার মিটিংটা কোথায় হচ্ছে—সেইটে জানতে এলুম।"

কিশোরী। সেই বাগানেই এবারো হবে—তেমন সুবিধার জায়গা অন্য কোথায় বলুন!

কার্ত্তিক। কিন্তু আমাদের ত সেটা বড় সুবিধা মনে হয় না। রোজ রোজ ট্রেণে করে যাওয়া-আসা—আপনারা বড়মানুষ লোক আপনাদেরই তা পোষায়। Rich men are nature's favourites! আজ যেন আফিস বন্ধ, আফিস খুল্লে ত কোন মতেই যেতে পারব না?

কিশোরী। রবিবারে কি আপনাদের আফিস থাকে নাকি?

কা। সমস্ত হপ্তা খাটব, মশায়—তারপর ত বাড়ী ঘর আছে। Home, sweet home!

কিশোরী বলিল—'সুইটের কথা যদি বলেন তাহলে আমিত বলি টাকার মত সুইট্ কিছু নেই?"

আপাততঃ টাকার অভাবই কিশোরী কি না মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। কার্ত্তিকবাবুও কথাটা ঠিক বলিয়া বুঝিলেন মনে মনে বলিলেন, "তা নইলে আর তোমাদের দলে ভিড়ি, বাবা! তবে টাকাটা হাতে না পেলে বিশ্বাস নেই।"

তিনি চৌকিখানা কিশোরীর একটু কাছে টানিয়া লইয়া পরে প্রকাশ্যে আস্তে আস্তে বলিলেন—"কিশোরী বাবু—আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে—সভার সব লোক ত বিশ্বাসী?"

কিশোরী। কেন বলুন দেখি? আমরাত সেই রকমই জানি।

কার্ত্তিক। আমার বিশেষ সন্দেহ হচ্ছে—কথাটা কি শুনেছেন ত? কাল রাত্রের খবরটা? কাউন্সেলে হঠাৎ

রাতারাতি Gagging Actটা পাশ হোল কেন বলুন দেখি?

কিশোরী। Downright injustice !.

কার্ত্তিক। আঃ সে যেন হোল,—তা আমি বলছিনে। আমার ভয় হচ্ছে বেটারা এ সভার খবরটা পেয়েছে।

কিশোরী হাসিয়া উঠিল—কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—"আরে, দাদা, হাসি নয়—ইংরাজদের চেন না তোমরা,—ওরা সব খবর পায়—ওদের গুপ্তচর যেখানে সেখানে।" এমন রহস্য জমাইবার সুযোগ কে ছাড়ে। কিশোরী হাস্য সম্বরণ করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"তাই বটে! মাষ্টার মশায় আঁচেন ঠিক! নইলে কোথাও কিচ্ছু নেই—এক বেটা ইংরাজ সেদিন গাড়ীতে মোশায় হাতাহাতি লাগায়!"

কার্ত্তিক। আমি তথনি ত ঠিকটা এঁচেছিলুম। তাহলে—তাহলে হাতাহাতিটা সত্যি হয়েছিল? তথন বাবা তোমরা লুকোলে—ভাবলে লোকটা বড়ই বোকা—যা বলবে অমনি জল বুঝে যাবে!

কিশোরী। মশায় দেশের জন্য কত লোকে প্রাণ দিচ্ছে আমরা ঐটুকু সইব না, তাও বলে বেড়াতে যাব?

কার্ত্তিক। তা, বাবা, তোমরা প্রাণ দাও, জান দাও, যা ইচ্ছে কর, কিন্তু আমি এ রকম জায়গায়,—না, বলছি কি, বলি সত্যি কি সবাই টাকা দেবে?

কিশোরী। কিসের?

কার্ত্তিক। এই সাবানের জন্য! প্রাণ, বাবা, সবাই কথায় কথায় দেয়—টাকাটা দেওয়াই কঠিন!

কিশোরী কার্ত্তিক বাবুর মনোগত অভিপ্রায়টা বুঝিল, হঠাৎ তাহার এক বুদ্ধি যোগাইল, মনে হইল—তাঁহাদের যদি আপাততঃ সভা হইতে ভাগাইতে পারে ত এ যাত্রা সে বাঁচিয়া যায়। বলিল—"মশায়, আপনার পাকা বুদ্ধি—আমি আর কি বলব? ঘরের কথা বলতেও ইচ্ছে করে না!"

কার্ত্তিক। বুঝেছি—টাকা পাবার আশা নেই, আমিও তাই ভাবছি—সব ছেলে ছোকরা, অত টাকা যোগাবে কি করে। কিন্তু তুমিই ত, বাবা, তখন আশা দিয়ে নিয়ে গেলে?

কিশোরী। আমি কি এখনো বলছি যে কিছু হবে না!

কার্ত্তিক। তা বলছ না ত কি? কিন্তু, বাবা, তুমি আছ—জীবন আছে!

কিশোরী। দাদা পশ্চিম গেছে। আর আমারো বোধ হয় টাকাটা দেবার আপাততঃ সুবিধা হোল না। কি জানেন বাবাকে বলতে সাহস পাচ্ছিনে, সম্প্রতি এই মারামারিটা হোল, কি জানি যদি বলে বসেন সভাটা ছাড়।

কার্ত্তিক। বটে শেষে এই! তা তোমরা প্রাণ দিতে হয় দাও আমি ত সভা ছাড়ছি। এখন ভাইটাকে বোঝাতে পারলে যে হয়।

কিশোরী। ওকি কথা, মশায়!

কার্ত্তিক। আর বাবা! আমি ত ধনে প্রাণে মরব

ঘলে সভায় যোগ দিইনি। কদিন হতে আফিসের সাহেব বেটা কথায় কথায় খুঁৎ ধরতে আরম্ভ করেছে, তখনি বুঝেছি ব্যাপারখানা কি! আর কিছু দিন সভায় থাকলে মশায় চাকরীটি পর্য্যন্ত যাবে। তোমরা বড়মানুষ তোমাদের ভাবনা কি, দেশহিতৈষিতা, নিঃস্বার্থপরতা তোমাদের পোষায়, আমাদের ত আর তা চলে না। তাতেই খবরটা নিতে এলুম; স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলে ত খুলে বলবে না। এখন সব শুনলুম বুঝলুম এখন মনের কথা লুকোনর দরকার নেই। এখন যাই ভাইটাকে বোঝাইগে! সভার প্রতি ত তার দারুণ বিশ্বাস; এ কথা শুনলে দেখি কেমন বিশ্বাস থাকে? সভার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত।

কিশোরী। কেন আসছে রবিবারটা না হয় নিজেই চলুন—Resign দিতে গেলেও ত সে কথাটা তাদের বলতে হবে?

কার্ত্তিক। না, বাবা, সে মুখো আর হচ্ছি না, তা হলেই সাহেব বেটারা ধরবে, চাকরীটী যাবে। Resign বাবা এই তোমার কাছেই দিলুম, তুমিই জানিও।

কিশোরী। কিন্তু গণেশ বাবু!

কার্ত্তিক। গণেশ বাবু! এখনো মশায় joint family system যায় নি! বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের মতামত চলে না, বুঝলে বাবা! সে আর এ মুখো হতে পাচ্ছে না, তার হয়ে আমিই বলে গেলুম। আর বল ত দু'নামেই আমি রিজাইন লিখে দিয়ে যাই।

কার্ত্তিকবাবু ত চলিয়া গেলেন, কিশোরী হাসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দু একদিন পরে খবরের কাগজে একটি সংবাদ পড়িয়া হাসির বদলে তাহার অত্যন্ত রাগ উপস্থিত হইল। খবরটা প্রত্যক্ষ বলিয়া লিখিত। সংবাদদাতা নাকি ঘটনার সময় এক গাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। (কথাটা সত্য, তবে এক কামরায় উপস্থিত ছিলেন না—এ কথাটা তিনি উল্লেখযোগ্য মনে করেন নাই)। সহসা অকারণে একজন ইংরাজ একজন নিরীহ বাঙ্গালী ছাত্রকে ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করিলেন, এমন তেমন মার নয়—তাহার পর ছাত্রের সঙ্গে যদিও সংবাদদাতার দেখা হয় নাই তথাপি ছাত্র যে এই আঘাতে শয্যাগত হইয়াছে ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। ছাত্রের প্রকাশ্য অপরাধ সে ইংরাজের সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়াছিল। কিন্তু ভিতরের কথা, সংবাদদাতা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছেন—যে, সাহেবের বাঙ্গালীমাত্রেরই উপর রাগ, কারণ বাঙ্গালীরা বিদ্যা বুদ্ধিতে সাহেবদের সমকক্ষ হইতে চাহে। উক্ত ছাত্রটি সম্প্রতি এক দেশহিতৈষী সভা করিয়া এই সাহেবের বিশেষ ক্রোধের পাত্র হইয়াছেন। ইংরাজেরা যে এই কারণে সম্প্রতি Gagging Act পাশ করিয়াছেন সংবাদদাতা এইরূপও আভাষ দিয়াছেন।

এই সংবাদ অবিলম্বে সহরে গ্রামে রাষ্ট্র হইল, কিন্তু যাঁহাদের লইয়া এ ঘটনা লিখিত কিশোরী ছাড়া তাঁহারা কেহই বুঝিলেন না—যে, উক্ত খ্যাতনামা-অনামা নায়কটি কে?

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

তিনটা বাজে বাজে, এখনো সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়ের দেখা নাই, আগন্তুক সভ্যগণ যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, এই সময় কিশোরী (সম্পাদক) সভাগৃহে পদার্পণ করিতেই, চারিদিক হইতে তাঁহার উপর বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। যাদব বলিল—"এই যে কিশোরী বাবু, এতক্ষণে বুঝি তোমার 'বার' হোল ?"

কৃষ্ণ। ওঁরা বাবুলোক মেজাজে চলেন ? ওঁদের উপর কথা কয় কে ?

শ্যাম। আমরা বেচারারাই বুঝি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি!

হেম। আরে ভাই, তুমি ত এলে! সভাপতি মশায় কি এখনো নিদ্রে দিচ্ছেন ?

কিশোরী। দাদা পশ্চিম গেছে।

নবীন এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই, নীরবে চুরট টানিতে টানিতে ঘূর্ণ্যমান ধূমকুণ্ডলীর দিকে চাহিয়া গুম হইয়া বসিয়াছিল, কিশোরীর কথা শুনিয়া এতক্ষণের পর বলিল "পশ্চিম!"

গোপাল। কথা নেই বার্ত্তা নেই হঠাৎ পশ্চিম! বেশ বেশ, তিনি যান পশ্চিম, তুমি যাও দক্ষিণ আর আমরা কটা নিষ্কর্ম্মাতে মিলে ১০টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত এইখানে বসে থাকি!

নবীন। একতা, দৃঢ়তা, কার্য্যনিষ্ঠতা!

কিশোরী রাগিয়া বলিল—"কেহ ত আর এমন প্রতিজ্ঞা করেনি যে সভার মেম্বর হলে কোথাও যাবে না?

বিহারী। তা নাই করুক—কিন্তু যখন সকলেই জীবনের জন্ম অপেক্ষা করছে তখন সময়ে তাঁর সভাকে জানান উচিত ছিল যে তিনি পশ্চিম যাচ্ছেন।

কিশোরী। সম্পাদককে জানানই সভাকে জানান, তাঁর কাজ তিনি করেছিলেন, আমি দৈবক্রমে আজ সকাল সকাল আসতে পারিনি।

এই সময়ে নবীনের পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—"কিন্তু শুধু আসবার ত কথা নয়—আরো কিছু সঙ্গে আনবার কথা, তার কিছু ব্যবস্থা করে গেছেন?"

কিশোরী চমকিয়া উঠিল, গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র বাক্যবাণে আক্রান্ত হওয়াতে তাহার আর চারিদিক ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ ছিল না, সুতরাং গণেশচন্দ্র যে নবীনের আড়ালে বসিয়া আছে তাহা সে দেখে নাই। কার্ত্তিকচন্দ্রের কথায় সে এমনি বুক আটিয়া আসিয়াছিল—যে তাহাদের কাহারো আসিবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তাহার মনে হয় নাই। হঠাৎ গণেশের কথা শুনিয়া সে নিতান্তই ভড়কিয়া গেল। তাহার কথা যোগাইল না।

চারু বলিল "কিশোরীবাবু, আমার টাকা সবটা আমি এবার আনতে পারিনি—৫০৲ টাকা এনেছি, ৫০৲ আসছে বারে দেব।"

গণেশ। একজন ত সমূলেন বিনশ্রুতি—অন্যজন ত অর্দ্ধেক. কিশোরী বাবু আপনি কি এনেছেন?

কিশোরী পকেটে হাত দিয়া বলিল—"হ্যাঁ—তা এনেছি বই কি? কিন্তু কার্ত্তিক বাবু ত আসেন নি?"

গণেশ। গণেশচন্দ্র ত এসেছেন?

কিশোরী। কিন্তু কার্ত্তিকবাবুর সঙ্গেই আমার কথা-বার্ত্তা।

গণেশ। আপনি কি তাহলে আমাকে অবিশ্বাস করছেন নাকি?

কিশোরী। এ অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না! কিন্তু business is always business.

গণেশ। কিন্তু আসলে ত আমিই কাজ করব, দাদা ত কিছু করবেন না।

নবীন। ভাই কিশোরী! এখানে ঠিক business-এর মত ব্যবহার করলে চলবে না, যখন আমরা ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হয়েছি—তখন যদি পরস্পরকে আমরা অতটুক বিশ্বাস না করতে পারি—তাহলে এ ভ্রাতৃত্বের অর্থই বা কি আর আবশ্যকই বা কি?

যাদব। এখন ও কথা উত্থাপন করলে কিশোরী বাবু আপনিই দোষী হন, যদি উনি আপনার বিশ্বাসের পাত্র না তবে আপনি ওঁকে সভায় recommend করলেন কি করে?

কিশোরী। আচ্ছা বেশ আমিই দোষী। সকলেই যদি এরূপ করে আমার দোষ দেখেন—আমি আপনা হতেই resign দিচ্ছি—আপনারা আর এক সেক্রেটারী দেখুন।

চারু ব্যস্ত হইয়া পড়িল, বলিল—"কিশোরীদা, তুমি

রিজাইন দিলে কি এ সভা থাকবে? রাগের মাথায় একটা কাজ করবেন না; আমাদের উদ্দেশ্যটা একবার ভেবে দেখুন!"

কিশোরী। আমি যে এত খাট্‌চি, টাকা বল, কড়ি বল এত ত্যাগ স্বীকার করচি—পড়া শুনার হানি করচি, অনেক সময় বাবার বিরক্তিভাজন পর্য্যন্ত হচ্চি, এসব কিসের জন্য? কার জন্য?

নবীন। যে জন্যই হোক, আমাদের অনুগ্রহ করার জন্য নয়।

কিশোরী। তা কি আমি বলছি? আমি জানি আমি অযোগ্য—আমি ত আগেই রিজাইন দিয়েছি!

চারু। নবীনবাবু, আপনি একটু বেশী দূর যাচ্ছেন। ওঁকে থাকতে অনুরোধ করুন।

নবীন স্বভাবতঃ নৈরাশ্যপ্রবণ। জগতের অমঙ্গল দিকটাই সর্ব্বপ্রথম তাহার দৃষ্টিতে আসে—অল্পেতে আশা ভরসা ঘুচিয়া যায়, সুতরাং এই ঘটনায় সে উদাসীন হইয়া পড়িল—তাহার মনে হইল—এ সভা টিঁকিয়া কোন লাভ নাই, ইহার সমস্তই ভুয়া, সমস্তই sham! সে বলিল, "আমিও রিজাইন দিচ্ছি। ত্যাগস্বীকারের মর্য্যাদা কোথায়—যদি আমরা তাতে কষ্ট অনুভব করি—যদি আমরা ত্যাগ বলে মনে করি? কিশোরীর কথায় প্রকাশ পাচ্ছে এই যে, আমরা আত্মবিসর্জ্জন কাকে বলে তা জানিনে—সুতরাং সত্যের মর্য্যাদা, উদ্দেশ্যের মর্য্যাদা রক্ষা, আমাদের কর্ম্ম নয়। সভার কর্ত্তা যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে যখন সময়ের জ্ঞান নেই, অনুষ্ঠানের দৃঢ়তা

নেই, অঙ্গীকারের পালন নেই, সত্য তিরস্কারটি পর্য্যন্ত যখন তাহাদের মর্ম্মে সয় না—তখন এ সভা বিড়ম্বনা মাত্র! আগে নিজের চরিত্র গঠন—তবে উচ্চ কার্য্যের অনুষ্ঠান। সভা ভাঙ্গুক তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমাদের অযোগ্যতার জন্যেই যে ভাঙ্গলো, এই দুঃখ। কিন্তু এর আর উপায় কি!"

অন্য যুবকেরা ইহার পর অনেকে অনেক কথা কহিল, কিন্তু কিশোরী ও নবীন বড় বেশী কথা কহিল না; সুতরাং চারিদিকের নিরানন্দ অবস্থাতেই সে দিন সভা ভঙ্গ হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

কিশোরী সেদিন মহা অশান্তি হৃদয়ে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। এখন যেন সে কোন রকমে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল, কিন্তু জীবন আসিলে ত আসল কথা প্রকাশ পাইবে, তাহার জুয়াচুরি ধরা পড়িবে। প্রথমতঃ এই এক মহা-ভাবনা,—দ্বিতীয়তঃ, কিশোরী যতই স্বার্থপর হউক না, যৌবনের নিঃস্বার্থতা, দেশহিতেচ্ছা তাহার মনে এখনো জাগরূক, স্বার্থপর প্রবৃত্তিস্রোতে এখনো তাহার হৃদয়ের মঙ্গলভাব একেবারে ডুবিয়া যায় নাই, সুতরাং যে সভার উপর তাহারা এত আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছিল তাহার কুবুদ্ধিতে তাহা মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেল, এই নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুতাপ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে যেন পুরাতন

সুখের জীবন হারাইয়া ফেলিল; আপনাকে তাহার শত বর্ষের বৃক্ষের মত উদ্দেশ্যশূন্য ভারাক্রান্ত মনে হইতে লাগিল। বাড়ী আসিয়াই সে কৌচে শুইয়া পড়িয়াছিল, কিছু পরে একবার উঠিল, ডেস্ক খুলিল, সম্মুখেই সেই খড়্গ, উঠাইয়া বারকতক নাড়াচাড়া করিল, তাহার পর সেখানা রাখিয়া দিয়া অতিকমলের শিশিটা হাতে উঠাইল, কিন্তু সহসা আবার তাহা সেইখানেই রাখিয়া ডেস্কের ডালাটা বিরক্তভাবে বন্ধ করিয়া কৌচে আসিয়া শুইয়া পড়িল। কিছু পরে হরি গৃহে বাতি দিতে প্রবেশ করিয়া কিশোরীকে দেখিয়া বলিল—"এই যে দাদাবাবু, আজ ডাহেন নি কেন? খাবার আনি?"

কিশোরী বলিল—"না, বকতে হবে না—যা!"

ভৃত্য ভাবিল—বাবু কোন বন্ধুর বাড়ী গিয়া চতুর্ব্বিধ খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে পেয় দ্রব্যেতেই আদৃত হইয়া থাকিবেন; যেরূপ মেজাজ কড়া—আদরটা বেশী রকম একটু মধুময় হইয়াছে সন্দেহ নাই, এইরূপ ভাবিয়া আর উচ্চ বাচ্য না করিয়া চলিয়া গেল। কিশোরী দীপশিখার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কিশোরী একবার কালীঘাটে গিয়াছিল দীপ শিখাটাকে তাহার কালীর জিহ্বার মত মনে হইতে লাগিল। সেই শিখা হইতে চারিদিকে যে কিরণকণা বাহির হইতেছে তাহা যেন রক্তস্রোত, সে যেন সেই রক্তের মধ্যে ডুবিয়া আছে। কিশোরী দীপশিখা হইতে নয়ন অন্যদিকে ফিরাইল, তখন চারিদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইল না। এই সময় জুতার শব্দ শোনা গেল, চারু তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। চারুও

দারুণ বিষণ্ণ –সভার গণ্ডগোল ব্যাপারে তাহারো মনে আজ সুখ নাই। তাহাকে দেখিয়া কিশোরীর আনন্দ হইল, একাকী অনুতাপ কষ্ট বহন করা দুঃসহ। চারু কিশোরীর নিকটে চৌকিতে বসিয়া বলিল—"কিশোরী বাবু, আপনার কি রাগ করা ভাল হইয়াছিল যখন জীবন বাবু যথার্থই দোষী ?"

কিশোরীর ইচ্ছা হইল, তাহাকে সমস্তই মনের কথা খুলিয়া বলিয়া মনের ভার লাঘব করে, কিন্তু সেই সঙ্কোচ! যখন একবার অন্যরূপ বলিয়াছে তখন ঠিক কথা বলিতে সাহস নাই, কিশোরী বলিল—"তুমি কি মনে কর—বন্ধুর নিন্দা শোনা বন্ধুর কাজ! আমি তাঁকে ডিফেণ্ড করব না ?"

চারু। কিন্তু সত্য সকল অপেক্ষা অধিক মাননীয়। যখন তিনি সত্যই দোষী—

কিশোরী। দোষী কেন ? আমাকে ত তিনি বলে গিয়েছিলেন—

চারু। কিন্তু টাকা!

কিশোরী। টাকার জন্য কি আটকাত ? আমি কি তা দিতে পারতুম না ? সে থাক! এই মনে কর না কেন, তোমার নামে কেউ যদি নিন্দা করে আমি কি চুপ করে থাকব ?

তাহার নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়া চারুর হৃদয় প্রশংসাপূর্ণ হইল। বলিল—"তা সত্যি। কিন্তু আপনি রিজাইন দিলেন কেন ?"

কিশোরী। সেজন্য কি ভাবচ আমার কষ্ট কম হচ্ছে ?

কিন্তু যেরূপ অবস্থা ঘটলো তাতে রিজাইন করা ছাড়া আর কি উপায় ছিল বল?

কিশোরী নিজের নিকট যেরূপ করিয়া ভাবিয়া দোষ মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছিল চারুকে তাহাই বলিল, সত্যই যে সমস্তই জ্ঞাতভাবে তাহাকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিল তাহা নহে।

চারু বলিল—"আচ্ছা যা হবার হয়েছে এখন নবীনদাকে বুঝিয়ে বলে যাতে সব চুকে যায় তাই করুন।"

কিশোরী। অ্যাপলজি করতে বল, কাণ মলতে বল, যা করতে বল এখনি করছি—কিন্তু নবীন ত তেমন পাত্র নয়!

চারু। আচ্ছা, জীবনদা আসুন—তিনি বুঝিয়ে বল্লে নবীন বাবু বুঝবেন।

কিশোরী। My dear boy—one can give reason —but not understanding!

চারু। কিন্তু নবীনদাকে ত ওরূপ অবুঝ বলে মনে হয় না!

কিশোরী। তোরা কবি লোক, লোকের ভাল দিকটাই কেবল দেখিস।

চারু হাসিয়া বলিল—"ভাল কথা কিশোরীদা, আমার কতকগুলো নতুন কবিতা হয়েছে।"

কিশোরী। এনেছিস?

চারু। পকেটে আছে বোধ হচ্ছে?

চারু পকেট হইতে কতকগুলা কাগজ বাহির

করিল। কিশোরী বলিল—"আচ্ছা আমি কাল পড়ব।" চারুর ইচ্ছা তখনি কিশোরী পড়ে, কিন্তু সে কথা বলিতে তাহার লজ্জা বোধ হইল, সুতরাং রাত হইয়াছে বলিয়া ইহার কিছু পরে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। চারুর সহিত কথায় বার্ত্তায় কিশোরীর সেই প্রথম তীব্র কষ্টের ভাব উপশম হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং ক্ষুধারও উদ্রেক হইল। চারু চলিয়া গেলে হরির ডাক পড়িল, আজ হরি কৃপা করিয়া দু এক ডাকেই নিকটে হাজির হইলেন, এবং আহার আনিতে আদিষ্ট হইয়া আবার চলিয়া গেলেন। কিশোরী উঠিয়া আবার ডেক্স খুলিল, খুলিয়া অডিকলমের শিশি মুখে তুলিল, এই সময় চারু আবার গৃহে প্রবেশ করিল। অনেক দিন মোহনের কাছ হইতে স্নেহলতা কোন পত্রাদি পায় নাই। মোহনের খবর জিজ্ঞাসা করিতে আবার সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

গৃহে আসিয়া কিশোরীর মুখে অডিকলমের শিশি দেখিয়া চারু অবাক হইয়া দাঁড়াইল, কিশোরীও ত্রস্তে শিশি নামাইয়া লইল। কিন্তু সহসা এরূপ লজ্জিত হইয়া পড়িল—যে কোন কথা কহিতে পারিল না। চারুরও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না, বলিল "এই বইখানা নিতে এসেছি"—বলিয়া টেবিল হইতে একখানা বই লইয়া চলিয়া গেল। কিছু পরে কিশোরী আত্মস্থ হইয়া ডাকিল—"চারু, চারু?" কিন্তু তখন চারু চলিয়া গিয়াছে।

কিশোরীর মনটা আবার বিগড়িয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"কি ভয়ানক! কিশোরী মদ খায়!" যেমন তেমন মদ না, অভিক্লসম—খাঁটি স্পিরিট! তবে ত সে একজন 'বও-য়াটে' ছোকরা! তাহার সঙ্গে ত আর তাহা হইলে ভাব রাখা উচিত নয়!"

চারু চিরকাল মদকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। কিশো-রীকে মদ খাইতে দেখিয়া তাহার মন বড়ই চটিয়া গেল এবং উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে সংকল্প করিয়া বসিল, কিশোরীর সহিত আর ভাব রাখিবে না। কিন্তু কিশোরীকে সে সত্যই ভালবাসিত, কিশোরী বড় সে ছোট—স্ত্রীলোকেরা যেমন পুরুষের উপর নির্ভর করে তাহার ভালবাসার মধ্যে সেইরূপ একটা নির্ভরের ভাব ছিল। সুতরাং এই সঙ্কল্পের জন্য তাহার সে রাত্রে ঘুম হইল না, এবং ইহার ফলে একটা কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিবার সময় ভাবিল লিখিবে এক-রূপ—কিন্তু লিখিয়া বসিল অন্যরূপ। সে ভাবিয়াছিল মদের উপর এমন আক্রমণ করিয়া লিখিবে যে অন্ধ মদ্যপায়ী যুবকদিগের তাহাতে সদ্য সদ্য চক্ষু ফুটিবে। কিন্তু বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরের একটা জানালা খুলিয়া দিবা মাত্র যখন আশ্বিনের হিমাচ্ছন্ন জ্যোৎস্নালোক তাহার চোখে পড়িল—তখন তাহার মনে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের কবিতার ভাব উদয় হইল। সে লিখিল,

শরতের হিমজোছনায়,
নিশীথিনী আকুল নয়নে চায়!
বহুদিন পরে যেন, পেয়েছে প্রণয়ী জনে,
অশ্রুর লহরী মাথা সুখের আলোক ভায়!
বসন্তের প্রথম বাতাস,
সুখের মাঝারে যথা জাগায় হুতাশ!
প্রাণ কেঁদে ওঠে হেরি নিশার ও ম্লান হাসি;
হারান স্মৃতির ছায়া বেড়ায় সমুখে ভাসি।
ও ছায়া কাহার ছায়া? ও মূরতি কার মায়া?
চিনিতে পারিনে যেন চিনি চিনি যত করি!
আকুল ব্যাকুল প্রাণ ধরিবারে আগুয়ান;
যতই ধরিতে যাই ধীরে ধীরে যায় সরি!
বড় যেন আপনার—ছিলরে সে এ জনার,
আজ কি ভাবিছে হেথা পাবে না আশ্রয়!
কাছে এসে তাই কি রে
পর ভেবে যায় ফিরে
ফুটন্ত জোছনা হাসি করি অশ্রুময়?
তাই প্রাণ কেঁদে ওঠে বুঝি এ সময়।

কবিতা লেখা হইয়া গেলে তাহার মনে বড়ই আনন্দ হইল, কিন্তু কাহাকেও ইহা না শুনাইলে ত এ আনন্দ সম্পূর্ণ হইবার নহে! অন্য সময় হইলে কিশোরীর কাছে সে প্রাতঃকালেই ছুটিয়া যাইত—আহা সে দিন এখন ফুরাইয়াছে! অন্য লোকা-ভাবে পরদিন চারু স্নেহলতাকে এই কবিতাটি পড়িয়া শুনাইল।

স্নেহলতা যদিও দ্বাদশ বৎসরের মাত্র, কিন্তু সে বাঙ্গালা

কবিতা, উপন্যাস যাহা পায় তাহাই পড়ে। বুঝুক না বুঝুক নিজের মনের মত সকলেরি একটা অর্থ করিয়া লয়, ইহারো সে সেইরূপ একটা সাদাসিধা অর্থ ভাবিয়া লইল। কিন্তু পড়া শেষ হইলে চারু যখন জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন হয়েছে? কি বুঝলি?" তখন এই কবিতাটি তাহার এতই গভীর ভাবযুক্ত বলিয়া মনে হইল—যে, সে যে ইহার কিছুই বুঝে নাই, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিল। সে কেবল বিস্ময় ও প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরুত্তর হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। প্রশংসা নহিলে কবিদের চলে না, চারু ভাবিল বেনাবনে মুক্তা ছড়ান হইয়াছে—সে ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল, কিশোরীর অভাব তখন সে বড়ই অনুভব করিতে লাগিল।

এইরূপে এক দিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন গেল—কিশোরীর অভাব তাহার উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল, চতুর্থ দিনে তাহার মনে কিশোরীর নিকট যাওয়ার ঔচিত্য সম্বন্ধে এরূপ অকাট্য যুক্তির উদয় হইল যে, তাহাতে আর ইতস্ততঃ করা তাহার পক্ষে অন্যায় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

প্রথম যুক্তি—বন্ধু যদি কোন বন্ধুর দুর্ব্বুদ্ধি দেখিলে তাহাকে সৎবুদ্ধি প্রদান না করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহা কি বন্ধুতার কার্য্য?

দ্বিতীয়—কিশোরী মদ খাইতেছিল কি অন্য ঔষধ তাহাও চারু জানে না।

তৃতীয়—এ সম্বন্ধে কিশোরীর কি বলার আছে তাহাও ত চারুর আগে জানা কর্ত্তব্য।

চতুর্থ এবং সর্ব্বাপেক্ষা জরুরি—কিশোরীর কাছে না যাইলে তাহার চলে না, অতএব যাইতেই হইবে।

এইরূপ অকাট্য যুক্তির বলে উপরোক্ত মীমাংসায় পৌঁছিয়া তখনি সে কিশোরীর নিকট যাইবে স্থির—এমন সময় কিশোরী স্বয়ং চারুর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

চারু বাহির বাটিতে তাহার ঘরে একখানি চৌকিতে বসিয়াছিল, টেবিলে তাহার সমুখে বই—কিন্তু তাহার দৃষ্টি তাহাতে নাই, সে অন্য মনে দেয়ালের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছে—কিশোরী আস্তে আস্তে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত দুই কাঁধে রাখিয়া আদর করিয়া ডাকিল, —"কি রে চারু—আর যে বড় আমাদের ওদিকে যাস নে?"

চারু আনন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল—কিশোরী স্বয়ং এখানে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছেন! সমস্ত ভুলিয়া সে বলিল—'আমি এই যাচ্ছিলুম।'

'তবে আয়' বলিয়া কিশোরী তাহার হাত ধরিল। সন্ধ্যার সময় কিশোরীর পাঠ গৃহে দুই বন্ধুর আবির্ভাব হইল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

চারুকে দেখিতে অনেকটা জগৎবাবুর মত। গৌরবর্ণ, নরম নরম ঢল ঢল ভাব। উন্নত কপালে ঘন ঘন চুল এলো খেলো রকমে লতাইয়া পড়িয়াছে। চুলের যেমন পারিপাট্য নাই—কাপড়েরও সেইরূপ। পরিধানে সামান্য ধুতী,

একটা পিরান আর চাদর মাত্র—সব রকমে সে দেখিতে নিতান্ত সাদাসিদে বালক—গোঁপের রেখা পর্য্যন্ত এখনো তাহার সুস্পষ্ট ঘন হইয়া উঠে নাই। চেহারায়, সাজে সজ্জায় কিশোরী তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কিশোরী ফিট বাবু, গায়ে কোট, কোটের উপর কোঁচান চাদর বাঁধা, পরণে চওড়াপেড়ে বাবু-ধুতী—কোটে ঘড়ি চেন,—পাতলা চুল এমন ফিট করিয়া আঁচড়ান যে একজন মস্তকতত্ত্ববিং শিরো-স্পর্শের পরিশ্রমটুকু গ্রহণ না করিয়াও কেবল দৃষ্টি দ্বারাই বিনায়াসে তাহার গুণাগুণ বর্ণনা করিতে পারেন। তবে শিরোবিজ্ঞানবিদের সূক্ষ্ম দর্শন আমাদের নাই, তাই পাঠককে আমরা কিশোরীর স্বভাবের সূক্ষ্ম সমালোচনা দিতে পারিলাম না। কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, যে কিশোরীর মাথায় মুখে বুদ্ধির অভাব নাই কিন্তু সে বুদ্ধিতে যেন উদারতার অভাব, তাহা যেন করুণ কোমল ভাবে সিঞ্চিত নহে।

কিশোরীর বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, মুখাবয়ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হউক তথাপি কিশোরী সুশ্রী—তাহার নবীন শ্মশ্রুজাল-শোভিত ওষ্ঠাধরে, শ্বেত সুন্দর দন্তে ও মনোহর হাসিতে কিশোরী সুশ্রী। কিশোরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও এই হাসির মাধুর্য্যে কোমল বলিয়া মনে হয়।

কিশোরী চারুর কবিতা শুনিয়া বলিল "কি সুন্দর! শুনে যেন আর আশ মেটে না! অনেকটা সেলির মতন, অনেকটা কেন আমার মনে হচ্ছিল ঠিক যেন আমি সেলির একটি কবিতা শুনছিলুম।" কিশোরী যে সেলির কবিতা বেশী পড়িয়াছে তাহা নহে, তবে জীবন ও নবীনের কাছে

তাহার সমালোচনা অনেক শুনিয়াছে বটে! চারুর আহ্লাদ আর ধরিল না, কিশোরী আবার বলিল—"সেলির নাইটেংগেল পড়েছ? সিম্‌প্লি ইথিরিয়াল! আমাদের ভাষাতে যে ওরূপ আইডিয়াল কবিতা বার হতে পারে তা আগে আমার মনেই হোত না।

'ও ছায়া কাহার ছায়া? ও মূরতি কার মায়া—

চিনিতে পারিনে কেন চিনি চিনি যত করি!' এক্স্‌সেলেণ্ট!"

চারু বলিল "কিশোরীদা—আমার অনেক সময় ঠিক ঐ রকম feeling হয়, যেন কাকে জানি, কে যেন আমার অতি কাছে অথচ তাকে ধরতে পারছিনে—"

কিশোরী। আন্‌-কমান সেলিব্রেসান আর কি?

নবীনের নিকট কিছু দিন পূর্ব্বে unconscious cerebration কথাটি শুনিয়া পর্য্যন্ত সে উহা ব্যবহারের সুবিধা খুঁজিতেছিল—কিন্তু দুঃখের বিষয় আপাততঃ তাহার ঠিক কথা দুইটি মাথায় আসিল না। যাহা হউক তাহাতে কোন ক্ষতি হইল না, চারুর নিকট সে ইহাতে ধরা পড়িবে না। চারু বলিল—"কিশোরীদা, কেন বল দেখি আমার ওরূপ হয়?"

কিশোরী। প্রকৃত কবির ত ঐ রকম হবারি কথা! সেলির সঙ্গে দেখছি তোমার আশ্চর্য্য মিল, চেহারাও কি অনেকটা তোর সেলিরি মতন—সত্যিই যেন "প্রকৃতির বালক"!

কিশোরী যে নিতান্তই খোসামোদ করিয়া এরূপ বলিল তাহা নহে, চারুর কবিতা প্রশংসা-দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাহার চক্ষে চারু সত্যই সেলি হইয়া

পড়িয়াছিল। নিকটে আয়না ছিল না—চারু নিজের মুখ পরীক্ষা করিতে পারিল না, কেবল নীরব হাসিতে মাত্র আনন্দ প্রকাশ করিল।

কিশোরী বলিল—"চারু, তোর সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে—এত দিন আসিস নি কেন?"

চারু স্পষ্ট উত্তর করিতে পারিল না—বলিল, "হয়ে ওঠেনি-কিশোরীদা!"

কি। 'হয়ে ওঠেনি'! আমার কাছে ঢাকছিস্? তুই আসল আমাকে মাতাল ভেবেছিলি—কেমন ঠিক কি না বল দেখি?

চা। তা ঠিক নয়—কিন্তু ও সব খাও কেন, কিশোরীদা?

কি। তুই ত আচ্ছা—আমি বুঝি রোজ খাই? এক দিন একটু খেলে কি রোজ খাওয়া হোল। ঔষধার্থে সুরা-পান, এ ত শাস্ত্র কথা।

চা। তোমার ত আর কোন ব্যামো হয় নি?

কি। এই ত অন্যায়! কি করে জান্‌লি যে ব্যামো হয়নি? আমি তখন মাথার কষ্টে মরে যাচ্ছিলুম।

চা। কিন্তু ঐ রকম করে করে তো অভ্যাস হয়ে যেতে পারে?

কি। আচ্ছা for argument's sake ধরে নে আমি নিয়মিত একটু করে খাই—আমার অভ্যাস হয়েছে, তাতেই বা দোষ কি? এই ত ইংরেজরা রোজ নিয়মিত খায়, তারা কি সে জন্যে একেবারে কাজের বার হয়ে গেছে, না কি? এ কেবল প্রেজুডিশ বইত নয়।

চারু। ক্রমশঃ নিয়মের মাত্রা বাড়বে। আমাদের দেশে ঐ রকমে কত লোক উচ্ছন্নে গেছে।

কি। সে ত আমারি হাত! আমার উপর তাহলে তোর অতটুকু বিশ্বাস নেই? বোঝা গেছে, আমাকে তুই নিতান্ত বওয়াটে ভাবিস!

চারু তখন মুস্কিলে পড়িয়া বলিল, "না না, কিশোরীদা, তা নয়।"

কি। আর 'না না' বোঝা গেছে। তাহলে আমি নিতান্তই মাতাল, ঘৃণ্য, দুশ্চরিত্র—এই ভাবিস?

চা। না, কিশোরীদা—

কিশোরী উঠিল, উঠিয়া ডেস্ক খুলিয়া শিশি বাহির করিয়া বলিল—"তোকে লুকোব না, এই দেখ আমার রয়েছে—যখন বড় অসুখ বোধ হয় কখনো কখনো একটু খাই, তাহলে বল আমি মাতাল?"

চারু। মাতাল না—কিন্তু না খেলেই ভাল।

কি। একটু খেলে মন্দ কি, আগে আমাকে বোঝা, তাহলে আমি কখনো স্পর্শ করব না।—আচ্ছা, আমি এই তৈরি করলুম—তুই খেয়ে দেখ—যদি বুঝিস মন্দ ফল হয়—তাহলে আমাকে বলিস।

কিশোরী ডেস্কের উপর হইতে কাঁচের গ্লাস একটা লইয়া তাহাতে একটুখানি অডিকলম ঢালিল, তাহার পর কোলঙ্গার কুঁজা হইতে তাহার সঙ্গে খানিকটা জল মিশাইয়া চারুর মুখের কাছে ধরিল।

চারু ভীত হইয়া বলিল—"না কিশোরীদা, মাপ কর!"

কি। তবে আমি নিতান্তই ড্রান্‌কার্ড, ব্ল্যাগার্ড, কেননা মদ ছুঁতে আমার প্রেজুডিশ নেই।

চা। না, না.—তা নয়।

কি। তা না ত কি?—আমি পাজি—আমি নচ্ছার!

চা। তা কে বলে?

কি। তার মানেই তাই।

চারু বলিল—'না, কিশোরীদা—আচ্ছা আমি চেকে দেখছি।"

চারু জিহ্বাগ্রে পানীয় স্পর্শ করিয়া গ্লাশ রাখিলে কিশোরী বলিল, "এ কি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ! মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড, সবটা খা! আমি assure করছি তুই অধঃপাতে যাবিনে, অন্ততঃ আমি কিরূপ অধঃপাতে গেছি সেটা পরীক্ষার জন্যও এক দিন খেয়ে দেখ।"

চারু অগত্যা সমস্তটা পান করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু কিশোরী অতি অল্প মাত্রাতেই পানীয় প্রস্তুত করিয়াছিল, সুতরাং চারু ইহার মন্দ ফল কিছুই বুঝিতে পারিল না; কেবল কিছু পরে তাহার মনে বরঞ্চ বেশ একটুখানি স্ফূর্ত্তির উদয় হইল। তাহার মনে হইল আজ সে অনেক কবিতা লিখিয়া ফেলিতে পারে। চারু বলিল, "কিশোরীদা, আচ্ছা তুমি কি feel কর যে তোমার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যেন জ্যোৎস্না ব'য়ে যায়? আমি—"

কি। তা আর করিনে? কিন্তু একা জ্যোৎস্না ভোগ করাতেও আরাম নেই, তাই তোকে চাই।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

চারু বলিল, "জীবনদা, রাগ করবেন না, আসলে কিন্তু আপনার জন্যই এরূপ ঘটেছে! আপনি যে পশ্চিম যাচ্ছেন সভায় সে খবরটা পাঠালেই তো হ'ত? —আচ্ছা সে যেন কিশোরীদার দোষ! কিন্তু আপনি টাকা গুলো ত দিয়ে গেলেই পারতেন?"

জীবন রাগিয়া কহিল, "টাকাগুলো! সে ত আমি দিয়েই গিয়েছিলুম। কিশোরী কেন যে সে কথা বলে নি সেই আশ্চর্য্য!"

চারু। হ্যাঁ হ্যাঁ তিনি টাকা দিতে বুঝি যাচ্ছিলেন, যেন বল্লেন টাকা দিতে তিনি প্রস্তুত—এই রকম কি একটা। কিন্তু তখন এমন গোলযোগ যে কে কার কথা শোনে! তবে তিনি নিশ্চয়ই বলেছিলেন—বুঝলেন, জীবনদা? আমার বোঝার ভুল হয়েছিল, এখন মনে পড়ছে। তিনি কেবল গণেশ বাবুকে টাকা দিতে আপত্তি করেন।

জীবন। কিন্তু তোমার যেমন বোঝার ভুল হয়েছে সকলেরই দেখছি সেইরকম হয়েছে, এর কারণ কি? আমি যে টাকা দিয়ে গিয়েছিলুম সেটা স্পষ্ট করে বল্লে ত আর কেউ ভুল বুঝত না।

চারু। সেটা কি জানেন—সব সময় সব কথা ঠিক বুগিয়ে ওঠে না। সে জন্য, জীবনদা, রাগ করা উচিত

ময়—বিশেষ আপনাকে defend করতে গিয়েই কিশোরী-দার মেজাজ অমন বিগড়ে গিয়েছিল !

জীবন। আমাকে 'defend'! কে তা করতে বলেছিল? তার ত কোন আবশ্যকই ছিল না।

এই কথায় চারু বড় রাগিয়া গেল। 'যার জন্য চুরি করে সেই বলে চোর।' জীবন এমনি কৃতঘ্ন। সে বলিল, "আমি হলে করতুম না—কিশোরীদা কেন করেছেন সে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন।"

জীবন দেখিল চারুর সহিত এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করা নিতান্ত নিষ্ফল। তাহার মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল তাহা চাপিয়া বলিল, "আমি এখনি সেখানে যাচ্ছি—তবে তুমি জগৎবাবুকে বলো মোহনদা বেশ সেরেছেন। আমি ত তার দেখা পেলুম না কাল পরশু আবার এক দিন শীঘ্রই আসবো।"

জীবন চলিয়া গেল একটা সন্দেহের ভাব, একটা কষ্টের ভাব একটা বিরক্তির ভাব হৃদয়ে লইয়া চলিয়া গেল। জীবন সবে মাত্র আজ সকালে পশ্চিম হইতে আসিয়াছে। প্রভাত আলোকের মতই বিমল আনন্দ লোক হৃদয়ে লইয়া আজ সে স্বদেশে পদার্পণ করিয়াছিল সন্ধ্যা'র অন্ধকার না আসিতে আসিতে হঠাৎ তাহার হৃদয় অশান্তির অন্ধকারে পূর্ণ হইল। তাহার আশা ছিল সভা হইতে দেশের একটা কাজ হইবে। যৌবনের এই নিঃস্বার্থ উদ্যম ময় আশায় আঘাত পাইয়া তাহার হৃদয়ে বড়ই ব্যথা লাগিয়াছে।

জীবনের আর কিশোরীর বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে হইল না। বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে কিশোরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল—কিশোরী আর একটি ছোকরার সহিত হাস্যালাপ করিতে করিতে চলিয়াছিল। জীবন যখন সহসা নিকটে আসিয়া গম্ভীরমুখে গম্ভীরস্বরে বলিল—"কিশোরি, একটা কথা আছে শোন"! তখন তাহার বুকের রক্ত যেন হঠাৎ উছলিয়া উঠিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়িল। একটি কথা না কহিয়া সে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বাগানের একটি নির্জ্জন প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল; অন্য ছোকরাটি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বাগানে প্রবেশ করিয়া দূরের একটি বেঞ্চে গিয়া বসিল।

জীবন বলিল—"কিশোরি, তুমি আমার টাকা খরচ করেছ?"

কিশোরীব উত্তর দিতে সাহস নাই, মৌন বিবর্ণ আনত মুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবন বড় রাগ করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কিশোরীর এই দীন কাতব ভাব দেখিয়া তাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল। জীবন ধীর করুণকণ্ঠে বলিল, "তোমার যদি টাকার আবশ্যক ছিল তবে আমায় সে কথা তখন বল্লেই তো হত, আর যদি বা খরচ করে ফেলেছিলে তবে সে কথা তখন সভায় বল্লে না কেন? তা না ক'রে সে কথা লুকিয়ে নিজে মিথ্যা ব্যবহার করলে, আমাকে প্রতারক দাঁড় করালে, আর সেই সঙ্গে আমাদের সমস্ত আশা ভরসা পর্য্যন্ত একেবারে ভস্মসাৎ করলে!"

কিশোরী কাতরকণ্ঠে বলিল, "দাদা, আমি বুঝেছি আমার খুব অন্যায় হয়েছে—কিন্তু কি করব?"

জীবন। 'কি করবে'? যা সত্যি ঘটেছে তাই সবাইকে খুলে বল আবার কি করবে! এখনো তা হলে—

কিশোরী। দাদা, ক্ষমা কর—আমি এরূপ আর কখন করব না।

জীবন। কিন্তু যা করেছ তার ত প্রতিকার চাই, খুলে বল্লে তুমিও মার্জ্জনা পাবে—আর তা হলে পুনরায় সভা প্রতিষ্ঠিত হবারও সম্ভাবনা থাকবে।

কিশোরীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। সে কাঁদিয়া বলিল, "দাদা, খুলে বল্লে আমাকে সকলে ঘৃণা করবে, চিরকালের জন্য আমি দোষী, চোর হয়ে থাকব, আমাকে কেউ আর বিশ্বাস করবে না—আমাকে ক্ষমা কর, দাদা, যা হয়ে গেছে ভুলে যাও, আমি আর কখনো এমন কাজ করব না।"

তাহার কাতরতা জীবনের হৃদয় স্পর্শ করিল। জীবন কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল—বুঝিল কিশোরী যাহা বলিতেছে তাহা নিতান্ত মিথ্যা নহে। সত্যই এ কথা প্রকাশ হইলে সাধারণের নিকট তাহার হেয় হইবার কথা! দোষ স্বীকারে যে উচ্চ সাহস ও উদার মহত্ত্ব আছে তাহা সকলের বুঝিবার মত নহে। যে উন্নতপ্রকৃতি আত্ম-দোষ স্বীকারের মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে পারে তাহা এ সংসারে অতি বিরল। জীবন বলিল—"কিশোরি, আমি যেন মাপ করলুম; কিন্তু——"

কিশোরী জীবনকে তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই আনন্দে হাত বাড়াইয়া বলিল—"ভাল করে বল, জীবনদা তুমি ক্ষমা করলে, বল কারো কাছে এ কথা বলবে না!"

জীবন তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া বিষণ্ণ মুখে বলিলেন—"আমি ক্ষমা করলুম, কিশোরি! যেন এই ক্ষমা ভবিষ্যতে তোমার জীবনকে অন্যায় হতে বিরত রাখতে পারে!"

তাহার কথা শেষ না হইতে হইতে দূর হইতে এক জন বলিল—"হ্যালো! জীবন যে!" কিশোরী জীবন, দুই জনেই সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল নবীন আসিতেছে। কিশোরী তাড়াতাড়ি বলিল "তবে, জীবনদা, এখন আমি যাই"—কিশোরীর কোনমতে এখন নবীনের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা নাই—সে সরিয়া পড়িল। কিশোরী চলিয়া গেল—জীবন নবীনের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এই যে নবীন, আস্তে আজ্ঞা হোক।"

নবীন। এমনি করেই কি হে একেবারে নিরুদ্দেশ হতে হয়?

জীবন বলিল—"হ্যা, ভাই, মোহনদার অসুখ শুনে তাড়াতাড়ি যেতে হয়েছিল, তা সত্য—"

নবীন। 'একতা, দৃঢ়তা, কার্য্য-তৎপরতা'! ওসব, ভাই, তুমিই শিক্ষা দিতে পার—ওসব কি আমাদের কর্ম্ম?—

এই বিদ্রূপ জীবনের মর্ম্মবিদ্ধ করিল, কিন্তু কি উত্তর করিবে? তাহাদের নিকট সত্যই জীবন দোষী।

সে বলিল "নবীন, ভাই, এক আধবার ভুল হয়ে গেলে কি আর তার মার্জ্জনা নেই?"

নবীন হাসি ছাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"ভুল ত সহস্রবার সকলেরি হয়ে থাকে তার মার্জ্জনা কি আমার

হাতে? তা নয়, ভাই। আমরা যে কাজে হাত দিয়েছিলুম আমরা তার এখনো উপযুক্ত হইনি; আমাদের মধ্যে পরস্পরের সে বিশ্বাস নেই; আমাদের নিজের মধ্যে সেই প্রবল অদম্য সত্যানুরাগ, কার্য্যানুরাগ নেই, সুতরাং আমরা একত্র মিলে হাসি গল্পে আষাঢ়ে উপন্যাস তৈরি করতে পারি, কিন্তু কাজ কিছু করতে পারব না, তবে কেন মিছে একটা আড়ম্বর।"

জীবন তাহার সহিত এ বিষয় লইয়া আরো খানিকটা তর্ক করিল, কেবল তর্ক নহে, সভা পুনর্গঠনের জন্য অনেক অনুনয় করিল—কিন্তু নবীনের মনের ভাব ইহাতে পরিবর্ত্তিত হইবার নহে, বিশ্বাস টলিবার নহে, তাহার এক কথা—যখন জীবনের উপর পর্য্যন্ত তাহারা নির্ভর করিতে পারিল না তখন আর নির্ভর কাহার উপর!

জীবন হৃদয়ের সহিত কিশোরীকে ক্ষমা করিয়াছিল। কিন্তু যখন ক্রমাগত নবীন তাহাকে বুঝাইতে লাগিল, জীবন নিতান্ত অন্যায় কাজ করিয়াছে, তাহা হইতেই সভার অধঃপতন, সমস্ত দুর্ঘটনার মূলই সে, দেশের কোন কাজ করিতে ইচ্ছা করাও তাহার মত লোকের পক্ষে একটা ধৃষ্টতা; তখন সেই উদার মার্জ্জনাও তাহার ব্যথা দূর করিতে পারিল না।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবন সে দিন, বাড়ী আসিয়া দেখিল জগৎবাবুর স্ত্রী আসিয়াছেন। জীবন গৃহে প্রবেশ করিতেই গৃহিণী বলিলেন, "বাবা, বেড়াতে গিয়েছিলে? ভাল আছ? মোহন ভাল আছে?"

জীবন প্রণাম করিয়া বলিল—"হ্যাঁ, মাসিমা!"

জীবনের-মা বলিলেন "বলব কি, দিদি—সবে মাত্র এক ঘড়ি চেন ছিল—তা আর খালাস করতে পারলুম না, ভেবে-ছিলুম এবার কব্‌ব—তা ছেলে শুন্‌লে না বেড়াতে গেল।"

কথাটা সম্পূর্ণ যদিও ঠিক নহে, কেন না সম্প্রতি জীব-নের যে মাহিয়ানা বাড়িয়াছে—বেড়াইতে যাইবার খরচটা সে উহা হইতেই চালাইয়া লইতে পারিত—তবে সভায় ১০০৲ টাকা দিবার জন্যই মায়ের জমান টাকা হইতে জীবনের কিছু ভিক্ষা লইতে হইয়াছিল। অবশ্য মা কিছু আর এ কথা জানিতেন না।

গৃহিণী জীবনের-মার দুঃখের কথা শুনিয়া সংক্ষেপে প্রথমে জিহ্বা তালুর সংস্পর্শে সহানুভূতি-সূচক চুচু শব্দ উৎপাদন করিয়া পরে বলিলেন—"হায়রে নিজের ধন আফেলা, আর বাবার আমার এই কষ্ট! তা মকদ্দামা না না করলে কি খুড় কিছুতেই দেবে না?"

জীবনের মা। তা দিলে আর কি ভাবনা ছিল বল?

গৃহিণী। তা স্ত্রীভাগ্যে ধন। আমার মেয়ের অদৃষ্টে থাকে ত সবই হবে।

গৃহিণী এইরূপে ইঙ্গিত করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার মেয়ের সহিত বিবাহ হইলে তিনি মকদ্দামা চালাইবেন। জীবনের একে মনের অবস্থা খারাপ, তাহার উপর এ সময় এরূপ কথা তাহার আদপেই ভাল লাগিল না। সে উঠিবার ফন্দী ভাবিতেছে, এমন সময় চাকর প্রদীপ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল, পিঠ পিঠ একটি বালিকা ঘরের কাছে আসিয়া জীবনকে দেখিয়া অপর দিকে সরিয়া গেল। জীবনের দরজার দিকে মুখ ছিল সুতরাং দীপালোকে জীবন বালিকাকে দেখিয়া অমনি অনুমান করিয়া লইল যে জগৎবাবুরই মেয়ে বুঝি তাহার জন্য ঘরে আসিতে পারিতেছে না। যদি বা আর কিছুক্ষণ সে ঘরে থাকিত কিন্তু ইহার পর আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিল না, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মাসিমা, উঠি তবে, একটু দরকার আছে।"

গৃহিণী হাসিমুখে বলিলেন—"এস, বাছা!"

জীবনের-মা রাগ করিয়া বলিলেন, "এক দণ্ড কি আমার কাছে বস্‌তে নেই! কেবল দরকার!"

জীবন হাসিয়া বলিল, "সারাদিনও যদি মায়ের কাছে থাকি—তবু মায়ের 'এক দণ্ড' আর ফুরায় না"! বলিতে বলিতে জীবন মাদুর হইতে এক লম্ফে জুতার কাছে সরিয়া দাঁড়াইল, এবং তাড়াতাড়িতে অর্দ্ধেক পা জুতার বাহিরে অর্দ্ধেক পা জুতার মধ্যে রাখিয়া কোন রকমে পা জোড়া ও জুতা-জোড়া এক সঙ্গে টানিয়া লইয়া বারান্দায় আসিয়া

উপস্থিত হইল। বারান্দায় আসিয়া যখন বুঝিল যে মায়েদের অনুরোধের সীমা পার হইয়াছে তখন নিশ্চিন্ত ভাবে জুতা পরিয়া সিঁড়ি দিয়া দুম্ দুম্ করিয়া নীচে নামিয়া গেল, তাহার পর আবার নিঃশব্দে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। নিঃশব্দে উপরে উঠিবার অর্থ এই, আজ আর তাহার বাহিরে যাইতে ইচ্ছা নাই, সে একাকী তাহার ঘরে থাকিতে চায়। কিন্তু মায়ের পাশের ঘরেই তাহার ঘর, মা যদি টের পান যে সে তাহার ঘরে আছে, তাহা হইলে তাহার ঘরে থাকা দায় হইয়া উঠিবে। সৌভাগ্যক্রমে মায়ের ঘর দিয়া তাহার ঘরে যাইবার পথ নহে, সুতরাং উক্তরূপ কৌশল অবলম্বনে বারান্দা ঘুরিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া আপাততঃ সে নিরুপদ্রব-শান্তিভোগের আশা করিতেছিল।

জীবন চলিয়া গেলে গৃহিণী বলিলেন, "বলি, জীবনের-মা, তবে এইবার দিন একটা ঠিক করে ফেলা যাক—মেয়ে বড় হয়ে উঠলো আর ত রাখা যায় না!"

জীবনের-মা বলিলেন—"একবার জীবনকে জিজ্ঞাসা করি—করেই সব ঠিক কর্‌ব; ওর মত হলে দিন ঠিক কর্‌তে কতক্ষণ?"

গৃ। তোর ঐ এক কথা! কেন মত হবে না! কেন ঐ ত আমি ছেলের সাক্ষাতে বল্লুম, তা বাছা ত কিছু বল্লে না? অভিভাবকের মত হলে নাকি ছেলের মত হয় না। আমি কাল দিনটিন ঠিক ক'রে ব'লে পাঠাব। এই অগ্রাণেই আমি দিতে বলি।

গৃহিণীর এই স্থির নিষ্পত্তির উপর জীবনের-মার আর

কোন কথা চলে না, কেন না তাহা হইলে দেখাইবে যেন তাঁহার ইচ্ছা নাই! তিনি মুস্কিলে পড়িয়া বলিলেন, "আচ্ছা সেই ভাল, আমিও ছেলেকে তাই বলব এখন।"

রাত্রে যখন জীবন খাইতে আসিল—তখন কিন্তু তিনি আর এ কথা উঠাইতে সাহস পাইলেন না,—তাহাকে কেমন যেন বড় গম্ভীব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পর-দিন সকালেও বলা হইল না; সেই দিনই স্কুল কালেজ খুলিবে, সুতরাং জীবন তাড়াতাড়ি খাইয়া চলিয়া গেল। দুদণ্ড কথা কহিবার সুবিধা না পাইলে ত আব এ কথা তোলা যায় না। বিকালে স্কুল হইতে আসিয়া জীবন খাইতে বসিলে তিনি সম্মুখে বসিষা একথা সে কথার পর বলিলেন—"জীবন! বাবা, তোব শ্বাশুড়ি যে দিন ঠিক করতে চায়?" জীবন তাহার কোন উত্তর না কবিযা বলিল, "জগৎ বাবুর মেযে ত? মেয়ে বুঝি বেশ ই বাজি জানে?" জীবন মায়ের কথায় রাগ না কবিযা নিজেই সেই কথা তুলিল, ইহাতে জীবনের মাব বড় আহ্লাদ হইল। তিনি বলিলেন, "জানে বই কি—খুব লেকা পড়া শিখেছে—তা মনেব মত হবে—তোরা আজকাল যেমন খুঁজিস—তাই হবে—" জীবন একটু হাসিল। পূর্ব্ব রাত্রে সে এখানে স্নেহলতাকে দেখিযাছিল, তাহার আবার সেই ছবি মনে পড়িল। জীবনেব-মা আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "তবে বাছা, ঠিক করে ফেলি? দেখা-মেয়ে, দস্তুরমত দেখাব দবকার নেই, তবে আচারটা বজায় রাখতে হবে, একটা মোহর কিনে দিস আমি দিন দেখে এক দিন মুখ দেখে আসব।"

জীবন ঠাট্টা করিয়া বলিল—"কি চমৎকার প্রথা! যে বিয়ে করবে সে দেখবে না—দেখতে যাবে আর একজন!" বুঝি ঠাট্টার মধ্যেও কিছু সত্য ছিল, বুঝি বা তাহার পূর্ব্ব রাত্রের মূর্ত্তি আর একবার দেখিতে ইচ্ছা হইতেছিল। জীবনের-মা বলিলেন, "না, বাবা, লক্ষ্মী আমার, এখন তাকে দেখিস্‌নে, শুভদৃষ্টির আগে দেখা অকলযাণ! জানা-শুনা-দেখা মেয়ে তোর দেখার দরকার ত নেই। আমার বাবা, তুই এক ছেলে,—শুভক্ষণে শুভদৃষ্টি হবে, তার আগে অকল্যাণ করিসনে, লক্ষ্মী বাবা!"

ইতিমধ্যে জীবন মনে মনে স্থির নিশ্চয় করিয়া ফেলিয়াছে যে জগৎ বাবুর মেয়েকেই সে কাল এখানে এবং তৎপূর্ব্বে জগৎ বাবুর বাড়ীতে দেখিযাছে। সুতরাং এরূপ স্থলে মায়ের কথা রাখিয়া লক্ষ্মী ছেলে হইবার সুযোগ কে ছাড়ে?

জীবন হাসিয়া বলিল, "না হয় নেই দেখলুম—তোমার ত পছন্দ হয়েছে তাহলেই হল!"

জীবনের মার বড় আহ্লাদ হইল! তিনি বলিলেন "লক্ষ্মী ছেলে! তোর যেন এইরূপ সুবোধ ছেলে হয়—আহা, বাছা আমার বরাবরই এমনি ঠাণ্ডা, মাঝে মাঝে এক এক সময় কেবল ঘাড়ে ভূত চাপে বই ত নয়!" এইরূপ কতক্ষণ জীবনের-মার মনের আবেগ চলিত ঠিক নাই—সহসা নীচে একটা গণ্ডগোল উঠিল, দাসী ডাকিল—"মা, মা, ও মা! পানপত্র এল!" চাকর হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "মাঠাকুরুণ, ডাক্তারবাবুর বাড়ীর লোক পানপত্র আনছে গো!"

বরের বাড়ী হইতেই সাধারণতঃ প্রথমে পানপত্র আসে। কিন্তু জগৎবাবুর স্ত্রী দেখিলেন তিনি গোড়া না বাঁধিলে কাজ এগোয় না, সুতরাং আগেই পানপত্র পাঠাইলেন। দরকারস্থলে নিয়মভঙ্গে দোষ হয় না।

চাকরের কথা শুনিয়া জীবন আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "এ কি মা! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই এই সব বন্দবস্ত করে বসে আছ—এখন আমি যদি না করি?"

মা। কেন বাছা—কাল যখন ঠাকুর-মা বল্লে, তখন ত তুই চুপ করে রইলি! যদি অমত হবে, তবে তখন তাকে স্পষ্ট করে বলাইত তোর ভাল ছিল। এখন বাছা—কি আর ওকথা বলতে আছে? পানপত্র করে কি বিয়ে ভাঙ্গে? তাহলে ও মেয়েকে কেউ নেবে না, ওর চির কলঙ্ক থাকবে! ওরা আমাদের জন্যে এত করছে বাছা, ও কথা মনে ঠাঁই দিলেও আমাদের অধর্ম্ম হয়। লক্ষ্মী ছেলে, গোল করিস নে।

জীবন কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল, মা আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। দেখিতে দেখিতে জগৎবাবুর দাসী চাকরে গৃহ পূরিয়া উঠিল। আগামী অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহ হইবে স্থির হইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবন পশ্চিম হইতে পেয়ারা, কমলালেবু প্রভৃতি ফল এবং অন্যান্য যে সমস্ত অল্পস্বল্প জিনিষ পত্র আনিয়াছিল জীবনের-মা সেই দিনই সর্ব্বাগ্রে তাহার কিছু কিছু জগৎ

বাবুর স্ত্রীকে পাঠাইয়া দেন। বেলা ১০॥ টা, জগৎবাবু ও বাড়ীর ছেলেমেয়েদের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। গৃহিণীর তখনো আহার হয় নাই, তিনি সবে মাত্র স্নান করিয়া আসিয়া বারান্দায় একখানি আসনে আয়না সম্মুখে করিয়া বসিয়াছেন। কমলি সরু চিরুনি দিয়া পিছনের তেলেজলে চোবান চুল-কগাছি আঁচড়াইয়া দিতেছে। সম্মুখে চুলের বালাই নাই, তবে সমস্ত মাথাতেই তেলের জব-জবানি সমানই। মাথার তেলো আর কণ্ঠা যত তেলে ভিজাইবে তত 'শরীল' ঠাণ্ডা হইবে, 'শরীলে' কোন অসুখ বিসুখ থাকিবে না; গৃহিণীর ইহা ধ্রুব বিশ্বাস। তিনি চান জগৎবাবু, চারু, টগর সকলেই প্রতিদিন অন্ততঃ এক ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার পরামর্শ অনুসারে তেল মাখেন। কিন্তু কাহারো সেরূপ সুবিধা হইয়া উঠে না! জগৎবাবু ও চারুর দুজনেরি ত সময়ের অভাব। যদিও গৃহিণীর ইহা ঠিক বিশ্বাস হয় না; এক ঘণ্টায় জগৎবাবুর রোগীগুলো সব নাকি মরিয়া যাইত, আর চারুর পড়ার সমস্ত ক্ষতি হইয়া পড়িত! ও একটা ওজর গো ওজর! যেমন বাপ তেমনি বেটা! সব সাহেবিআনা! তাঁহাদের উপর গৃহিণীর এ বিষয়ে এক্তার চলে না; কিন্তু টগর, যাহার উপর এক্তার চলিতে পারে, তাহা-কেও তিনি সহজে বড় আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। কাছে বসিয়া তেল না মাখিলে সর্ব্বনাশ করিবেন এইরূপে প্রতিদিন শাসন করিলেও টগর তাঁহাকে লুকাইয়া আগে ভাগে স্নান করিয়া লয়, তিনি শেষে জানিতে পারিয়া নিষ্ফল-গালিতে ক্রোধ নিবারণ করেন এবং তিন জনের তেল নিজে মাখিয়া

ইহার শোধ তুলিয়া থাকেন। যাহা হউক আপাততঃ দাসী তাঁহার চুল আঁচড়াইতেছিল, তিনি ভিজা গামছা দিয়া মুখের ধৌতাবশিষ্ট তৈল মুছিতেছিলেন। মোছা হইয়া গেলে আয়নার খোপ হইতে সিন্দুরের কৌটা বাহির করিয়া অঙ্গুলির আগায় লইয়া কপালে একটি মস্ত টিপ পরিলেন, পরে চিরুণীর অগ্রভাগে সিন্দূর লইয়া কেশ-বিহীন সীমন্তে প্রচুর পরিমাণে লেপিয়া দিলেন। টগর এতক্ষণ মায়ের কাছে বসিয়া এক পয়সার একখানি ছোট আয়না মুখের কাছে ধরিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে মাঝে মাঝে লাল জিভ বাহির করিয়া দেখিতেছিল। মাকে সিন্দূর পরিতে দেখিয়া টগর বলিল, "মা, আমি প'রব!"

গৃহিণী বলিলেন, "ছেলে মানুষ সিঁদূর পরে না, ছিঃ।"

না। দিদি কেন পরে, আমি প'রব।

দাসী বলিল, "ন্যাকা আর কি! দিদির যে বিয়ে হয়েছে।"

টগর। তুই থাম—হ্যাঁ, মা, প'রব!

মা রাগ করিয়া বলিলেন—'এমন মেয়েও দেখিনি! আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, এখনো জ্ঞান বুদ্ধি হোল না! এই পর"! বলিয়া কপালে একটা টিপ দিয়া দিলেন।

টগর বলিল, "না, মাথায় দেব। দিদি দেয়—বেশ দেখায়!" বলিয়া সিন্দুরের কৌটাটা দখল করিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

মা বলিলেন,—"মেরে ফেলব বলছি! উঠে যা, পোড়ার-মুখি!"

দাসী বলিল, "হবে গো হবে, শীগ্‌গিরই সাধ মিটবে! ঐ যে শ্বশুরবাড়ীর ঝিও আসছে।"

শ্বশুরবাড়ীর নাম শুনিয়া টগর দৌড় মারিল। ভবি-দাসী ডালি হাতে হেলিতে দুলিতে আসিয়া দেখা দিল. তারপর ডালি নামাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "দাদাবাবু এসেছেন গো, এই সব নিয়ে এসেচেন, তাই মা পাঠালেন আর বল্লেন, একদিন যেন আপুনি শীগ্‌গির যেও।"

গৃহিনীও অনেক দিন হইতে ভাবিতেছেন একদিন জীবনের-মার বাড়ী যাইবেন; গিয়া বিবাহের সব পাকা-পাকি বন্দবস্ত করিয়া আসিবেন। জীবন আসিয়াছে শুনিয়া বলিলেন, "তা জীবনের-মাকে বলিস আমি আজই যাব।"

দাসী। তা মেয়েদেরও নিয়ে যেও, মা বলেছেন।

কমলি বলিল, "তা না কি হয়! বিয়ের আগে কি শ্বশুরবাড়ী যেতে আছে, দিনে ক্ষেণে একেবারে ঘরে পা দেবে!"

ভবি। তা বাপু আমাকে মা যা বল্লে তাই বন্নু। এ তো আর পরের ঘর নয়, আপন ঘরেই বিয়ে, না নিয়ে গেলে মা কিন্তু দুঃখু করবে। তা বড়বৌমাকে নিয়ে যেতে ত দোষ নেই, তাকেই না হয় নিয়ে যেও।

দাসীর বড়বৌমার প্রতি কিছু বেশী টান সুতরাং গৃহিনী যখন তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন সে আর অন্য অনুরোধ করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না।

গৃহিনী যে সেই দিনই বিকালে স্নেহলতাকে লইয়া জীবনের-মার বাড়ী গিয়াছিলেন তাহা পাঠক জানেন।

খানিকক্ষণ স্নেহলতা তাঁহাদের সহিত একত্র বসিয়া রহিল। কিন্তু কতক্ষণ আর সে তাঁহাদের দুজনের গল্প নীরবে বসিয়া শুনিবে? তাঁহারা দুই জনে গল্প করিতে লাগিলেন—ইতিমধ্যে সে উঠিয়া খানিকটা এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিল; অবশেষে পাশের ঘরে জীবনের টেবিলের উপর কতকগুলো বই দেখিয়া সেখানে আড্ডা লইয়া একখানি চৌকিতে বসিল। টেবিলে বাঙ্গালা বই একখানিও খুঁজিয়া মিলিল না, Lamb's Tales একখানি পাইয়া তাহাই পড়িতে আরম্ভ করিল, বাড়ীতে সে এই বইখানি পড়িত। সন্ধ্যা হইয়া আসিল আর অক্ষর স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু তাহার এত ভাল লাগিয়াছে যে জানালার কাছে বই হাতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। যখন একটুও আর দেখা গেল না, তখন বইখানি ছাড়িয়া জীবনের-মার ঘরের দিকে ফিরিল, গৃহে প্রবেশ করিতে গিয়া জীবনকে দেখিয়া আবার ফিরিয়া পূর্ব্বোক্ত গৃহে আসিয়া বসিল। ইতিমধ্যে চাকর প্রদীপ রাখিয়া গিয়াছিল। টেবিলের কাছে বসিয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল, সুতরাং জীবন যখন নিঃশব্দে গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল সে তখন জানিতেও পারে নাই।

কতক্ষণ ধরিয়া জীবন এইরূপে এইখানে দাঁড়াইয়া এই জীবন্ত কবিতার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেছিল—জীবনও তাহা জানে না। সহসা সন্ধ্যাতারার আলোক-পূর্ণ দুই চঞ্চল আঁখি-তারা তাহার নয়নের উপর সন্নিবিষ্ট হইল, সহসা নয়ন উঠাইয়া জীবনকে দেখিয়া বালিকা সলজ্জে উঠিয়া দাঁড়াইল, অতি

ধীর মধুর লজ্জার হাসি হাসিয়া চঞ্চলপদে ঘর হইতে পলাইয়া গেল, সে হাসিতে জীবনের হৃদয়ে কি যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দ সিঞ্চিত করিয়া গেল। বালিকা চলিয়া গেল, জীবন ধীরে ধীরে তাহার পরিত্যক্ত চৌকিতে আসিয়া বসিয়া দেখিল বালিকা কি বই পড়িতেছিল। দেখিতে দেখিতে আপন মনে বলিল—

"A thing of beauty is a joy for ever :
Its loveliness increases, it will never
Pass into nothingness , but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams, and health, and quiet
breathing."

এখন পাঠক বুঝিলেন কাহাকে ভাবিয়া জীবন তাহার পর বিনা আপত্তিতে মায়ের কথায় বিবাহে সম্মত হইয়াছিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"ঐলো বর বাড়ীর ভিতর আসছে!"

"উলু দে লো উলু দে—শাঁক বাজা!"

"ও কমলি, বাজন্দারগুলোকে ভাল ক'রে বাজাতে বল্। দিদি, বরণডালা কোথায়?"

"বরণডালা, ছিরি, ধুধরার পিদীম, জলের ঘটি, ধান দুব্বো, সব নিয়েচি লো নিয়েচি—ছাদ্‌লাতলায় চল।"

"নাপিতছেলে আবার কোথায় গেল—এই যে, শশি! ভাল করে গাল দিয়ো বাছা, দেখো যেন কেউ দৃষ্টি না দেয়!"

বাহিরবাটিতে ঝমাঝ্‌ঝম্‌ ঢাক ঢোল—কাঁশর ঘণ্টা পড়িল। বর জামাতাবরণের পর সভা হইতে উঠিয়া এই বাদ্যবাদন সমারোহের মধ্য দিয়া শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি চীৎকারধ্বনি পরিপূর্ণ অন্তঃপুরে আনীত হইয়া নির্দ্দিষ্ট কলাতলায় দণ্ডায়মান হইলেন। সপ্তসধবা নানা অনুষ্ঠানে বর প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া থামিলে যুবতীজনমনোলোভা-লজ্জাপরায়ণা অর্দ্ধবয়সী শ্বশ্রূঠাকুরাণী আবাহু-অলঙ্কৃত হস্ত-চালনা দ্বারা বিধিমত প্রকারে বরণ কার্য্য সমাধা করিলেন।

গূঢ়তত্ত্বদর্শীরা বলিয়া থাকেন, বরণের গূঢ় অর্থ বশী-করণ। ইয়রোপে জৈবিক চুম্বক-শক্তির আবিষ্কার এক শতাব্দী মাত্র—বহু পুরাতন ভারতের বরণপ্রথায় এ জ্ঞানের পরিচয়! 'জয় ভারতের জয়, হোক ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়!'

তত্ত্বদর্শীগণের সহিত একতানে একপ্রাণে আমরাও ভারতের জয়সঙ্গীত গাহিতেছি; কিন্তু শ্বাশুড়ীঠাকুরাণীদের দল কিছুতেই হাস্যমুখ নহেন। কলিযুগের বরণে সত্যযুগের ফল দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা নিতান্তই ভগ্ন-হৃদয়। জামাতাকে রাশ মানাইবার জন্য একমাত্র বরণের উপর তাঁহাদের নির্ভর করিলে আর চলে না! তাঁহাদিগকে এ জন্য অগত্যা এখন নানা প্রকার "তুকের" আশ্রয় গ্রহণ করিতে

হইয়াছে। বর্ত্তমানস্থলে কলিযুগাবিষ্কৃত কোনরূপ তুকই বাকী রহিল না। শ্বাশুড়িঠাকুরাণী কৌটা বন্ধ করিয়া তাহার মধ্যে জামাতার চিত্ত চিরকালের জন্য বন্ধ করিলেন ; কলার 'বাসনায়' পিন গুঁজিয়া. কুলুপে চাবি দিয়া—জামাতার জিহ্বার অস্তিত্ব দূর করিলেন ; এবং নাকের নিকট পাকাটি ভাঙ্গিয়া তাহার নাসিকা পর্য্যন্ত উড়াইয়া তবে ছাড়িলেন।

এইখানে জনান্তিকে শ্বশ্রূঠাকুরাণীদিগের প্রতি নিবেদন—তৃতীয় প্রথাটির অর্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় প্রথাটির—বিশেষতঃ দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণ সহানুভূতি। একাধারে দুই জিহ্বা আমাদের মতেও নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং সর্ব্বস্থলে উত্তমার্দ্ধের প্রবল জিহ্বা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া অধমার্দ্ধের উপর জয় লাভ করুক—এই ক্ষেত্রে আমাদের এই আশীর্ব্বাদ !

এইরূপে জামাতাকে চিত্তহীন, জিহ্বাহীন, নাসিকাহীন করিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণী হৃষ্টচিত্তে তাহার দুই হাতের মধ্যে মাকু রাখিয়া সুতা দিয়া হাত বাঁধিয়া বলিলেন—

"কড়ি দিয়ে কিনলুম, দড়ি দিয়ে বাঁধলুম,
হাতে দিলুম মাকু—একবার ভ্যা কর ত বাপু !"

মেয়ের দলকে দল জামাইয়ের ভেড়ার ডাক শুনিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল। বেচারা বর না ডাকিয়াও নীরবে ভেড়া বনিয়া গেলেন। এই সময় রব উঠিল—"পথ দাও, পথ দাও !" এইবার শুভদৃষ্টির আয়োজন।

এতক্ষণ অন্য গৃহে নির্জ্জনে পিঁড়ির উপর কন্যা একাকী

বসিয়া ছিলেন। সেই কাষ্ঠাসনসহ কন্যা বহন করিয়া চারি জন পুরুষ "পথ দাও—পথ দাও" করিতে করিতে ছাদ্‌নাতলায় আসিয়া পড়িলেন। অমনি বরের সম্মুখে বস্ত্র যবনিকা ধৃত হইল,—কন্যার কাষ্ঠাসন তাহার অন্তরালে আনীত হইয়া আনুসঙ্গিক গৌণ অনুষ্ঠানাদি -"বর বড় না কনে বড়" ইত্যাদি—শেষ করিয়া কন্যাবাহকগণ কন্যাকে লইয়া সপ্তবার বরকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বরের সম্মুখে কাষ্ঠাসন ধৃত করিলেন। যবনিকা অন্তর্হিত হইল; পরামাণিকমহাশয় দুষমণদিগকে গালি পাড়িয়া থামিলেন। কন্যার মাতা বলিলেন "চাও, বাবা,—ভাল করে চাও; মা, ভাল করে দেখ, শুভদৃষ্টি হোক!"

বর তৃষিত-দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিল। সেই বহু-প্রত্যাশিত মধুর সুন্দর নয়নালোকে নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে জীবন আকুল হইয়া চাহিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে দিকবিদিকব্যাপী অন্ধকারে তাহার নয়ন ভরিয়া গেল, ঘূর্ণমান মস্তক, স্তম্ভিত দেহপ্রাণ ভীষণ অন্ধকারময় মহাশূন্যের মধ্যে সহসা যেন বিলয় প্রাপ্ত হইল।

*   *   *   *

তথাপি বিবাহ স্থগিত হইল না, শুভ দৃষ্টির পর বর কন্যা সম্প্রদান স্থলে আনীত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন। জীবনের জীবন-শূন্য দেহ কলের পুত্তলির মত অন্যের উচ্চারিত শব্দের অনুসরণ করিয়া গেল। তাহার পর বরকন্যা অন্তঃপুর বাসর ঘরে আনীত হইলেন।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের পক্ষে বাসর ঘরের

বরপীড়ন উৎসব কিরূপ উল্লাসময় তাহা প্রসিদ্ধ কথা। সে দিন মেয়েরা বরকে মেয়ের শামিলই জ্ঞান করিয়া থাকেন, এদিনে সম্পর্ক বিচার পর্য্যন্ত থাকে না—শ্বাশুড়ি-সম্পর্কীয়া নবীনা ভামিনীগণও এ দিনে তামাসার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কেহবা সম্পর্কটাকে ক্ষণস্থায়ী বন্দোবস্তে সুবিধামত পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলেন, কেহবা ততটা আবশ্যক বিবেচনা না করিয়া নিঃশব্দে পশ্চাত হইতে কাণ মলিয়া যান—আর সমুখে আসিয়া আধ-ঘোমটার মধ্য হইতে বাছা বাছা রসিকতার কথা কহিতেও ছাড়েন না। কিন্তু আজ যে নৈরাশ্যময় অবসন্নভাব লইয়া জীবন বিবাহের পর বাসর গৃহে আসিয়া বসিয়াছে—কৌতুকপরায়ণা রমণীগণ তাঁহাদের সরস রসনা নির্গত খর বচনে এবং কোমল কর-কমল-তাড়নেও তাহা দূর কবিতে পারিতেছিলেন না। তাই বাসরঘরের আমোদ যেন আজ ততটা জমাট বাঁধে নাই। বরের এই অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে যুবতীগণ বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। চারিদিক হইতে নানারূপ নৈরাশ্যসূচক কথা উঠিতেছিল—

"ওমা, একি গোমসা বর গা! কথা কয় না কেন?"

"ওল্ দেলো ঠাকুরঝি – বোল ফুটবে।"

"ভ্যাল্লা বর পেয়েছিস, টগর! তোর জন্যে সব কথা জমিয়ে রেখে দিচ্ছে!" ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সাধারণ হা হুতাশের মধ্যেও বাসরঘরের নিত্য নৈমিত্তিক পীড়ন অনুষ্ঠান কিছু মাত্র কম প'ড নাই। বরের উপর চারিদিক হইতে সমানই (যদি

বা অধিক না হয় হস্তাস্ত্র ও বাক্যাস্ত্রের প্রয়োগ চলিয়াছিল।

কেবল তাহাই নহে; মূঢ়মতি বরের গুণকীর্ত্তনচ্ছলে পাড়ার সুরসিকা, সুগায়িকা, বটব্যাল-ভগিনী বামার-মা ওরফে সর্ব্বজন সুবাদে 'বামুনদিদি' ঠাকুরাণী নিজের কোকিল-কণ্ঠের পরিচয় প্রদানেও ত্রুটি করিলেন না। তিনি গান ধরিলেন,—

ছি ছি! কেমন জামাই, লাজে মরে যাই!
ঢুলু ঢুলু আঁখ, মুখে নাহি বাক্,
শিরে জটাজুট অঙ্গে মাখা ছাই!
আমাদের উমা, সোণার প্রতিমা,
মরি! ফণি কণ্ঠে যেন মণির মহিমা!
ধিক তোরে রাণি! হইয়ে জননী
হলি, এমন পাষাণী কেমনে, শুধাই?
কবি বলে ধনি, বলিছ না ভাল,
কালো না থাকিলে শোভিত কি আলো!
নীরদে দামিনী, কমলে মধুপ,
রূপের জগতে কুহক-অরূপ,
তাইত দেখিতে পাই!

সকলেই বরকে ঠাট্টা করিতেছে। স্নেহলতা জীবনকে ঠকাইবার অভিপ্রায়ে মাটির ঢেলা পূরিয়া একটি পান সাজিয়া আনিল, ইচ্ছা পানটি হাতে দিয়া তাহাকে খাইতে বলে। কিন্তু লজ্জায় ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া একজন বলিল,— "দাও না, তার আর লজ্জা কি? একে ভগ্নীপোত— তায়

দেওর,—ঠাট্টারই ত সম্পর্ক!" স্নেহলতা একটু হাসিয়া বরের নিকটে আসিয়া পানটি বাড়াইয়া বলিল—"বর, পান খাও!"

জীবন তাহার দিকে চাহিল। এতক্ষণ পরে এইবার সে এখানে প্রথম স্নেহলতাকে দেখিল—সেই কোমল মধুর নিরুপম সৌন্দর্য্যময়ী দেবী প্রতিমা! জীবনের অন্ধকার নিরানন্দ-প্রাণ সহসা জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল।

"Whence that completed form of all
completeness ?
Whence came that high perfection of all
sweetness ?

তাহার নীরব অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়আনন্দে এই ভাব ওতপ্রোত হইয়া উঠিল।

স্নেহলতা আবার বলিল—"বর, পান খাও!"

জীবন পান লইয়া মুখ আনত করিল। নত মুখে ভাবিতে ভাবিতে পানটি মুখে দিয়া কখন খাইয়া ফেলিল, তাহাতে ঢিল ছিল কি পাটকেল ছিল জানিতেও পারিল্ না। তাহার এই বেআকুবি দেখিয়া চাবিদিকে হাসি ঠাট্টার তরঙ্গ চলিতে লাগিল। টগর ঘোমটার মধ্য হইতেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

জীবন লজ্জিত হইয়া আর একবার স্নেহের মুখের দিকে চাহিল—স্নেহ হাসিয়া চলিয়া গেল। ইত্যবসরে আর একজন সুরসিকা স্নেহকে আর একটি সুপরামর্শ প্রদান করিলেন, তাহাই পালন করিবার অভিপ্রায়ে আস্তে আস্তে বরের

পশ্চাতে আসিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার কাপড়ের খুঁট টানিয়া লইয়া একটা পিন দিয়া বিছানার সঙ্গে আটকাইয়া দিল, তাহার পর কতকগুলি ফুল ও খানিকটা গোলাপ জল তাহার মাথার উপর ছড়াইয়া দিয়া পলাইয়া গেল। এইরূপ উপদ্রবে রাত দুই প্রহর হইয়া পড়িল।

গৃহিণী গৃহে আসিয়া বলিলেন,—"রাত অনেক হলো—মেয়ে জামাইকে শুইয়ে দে না, আর কেন?" ইহার পর বেশীক্ষণ বরকে বসাইয়া রাখিতে আর কাহারও বড় সাহস হইল না। উঠিতে সম্মতি পাইয়া বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন—আর সেই সঙ্গে পিনে-আঁটা চাদরটাও পট করিয়া জোরে উঠিয়া আসিল। আর একবার ইহাতে সকলে মহা হাসি হাসিয়া লইয়া রীতিমত অনুষ্ঠানে বর কন্যাকে শয্যাশায়িত করিয়া চলিয়া গেলেন। অবশ্য রাত্রের আড়িপাতার পালা-টাও ইহার পর বাদ পড়ে নাই।

নিস্তব্ধ রাত্রিতে, শুভ বাসর শয্যায়, নবপরিণীতা বালি-কার পার্শ্বে শয়ন করিয়া জীবন দারুণ যন্ত্রণা ভারে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। জীবন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে লাগিল স্নেহ-লতাকে সে কিরূপ ভালবাসে, তাহার হৃদয় প্রাণ আত্মা তাহারই, অথচ সমাজে সে অন্যের। কাহাকে আত্ম সম-র্পণ করিতে আসিয়া কাহার ভার সে গ্রহণ করিল! অদৃষ্টের এ কি বিড়ম্বনা!

দার্শনিকেরা বলেন—'অন্যের দুর্দ্দশা দেখিলে লোকে আনন্দলাভ না করিয়া থাকিতে পারে না।' কথাটা সর্ব্ব কালে সত্য বলিয়া মানি না, তবে জানি না—হয়ত বা স্পর্ধ-

নের দুরবস্থায় কোন কোন পাঠক হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন—"হঠাৎ এতটা কেন? স্নেহলতাকে জীবন দু' চার দিন দূরে দূরে দেখিয়াছে বইত নয়—ইহাতেই এতটা বাড়া-বাড়ি—এতটা মারাত্মক ব্যাপার,—শুষ্ক ডাঙ্গায় সহসা এতটা হাবুডুবু—এ কেন?"

এ কথার উত্তর দেওয়া নিতান্ত সহজ নয়—আমরাও ভাবিতেছি "কেন"?

যদি বল ইহা রূপের আকর্ষণ তাহা হইলেও ঠিক বলা হয় না। স্নেহলতার মাধুর্য্যে জীবনের অতৃপ্ত সৌন্দর্য্য-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইয়াছে বটে, তাহার মূর্ত্তি তাহার কল্পনা-নয়নে সৌন্দর্য্যের রুদ্ধ অনন্ত-রাজ্য খুলিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া স্নেহলতাকে ত অপূর্ব্ব সুন্দরী বলা যায় না। অন্ততঃ খ্যাত-প্রতিপত্তি সৌন্দর্য্যসমালোচিকাগণ, এবং সৌন্দর্য্যবিচারক রূপ সর্ব্বস্ব ভাবুকগণ, জীবনের এই অমা-র্জ্জিত হীন রুচির পরিচয়ে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিবেন— "স্নেহলতা এমনি কি সুন্দরী!" আমরাও বলি, স্নেহলতা এমনি কি সুন্দরী! তাহার সৌন্দর্য্যের মধ্যে কোমল লালিত্য টুকু, আর করুণ শ্রীখানি! কিন্তু পত্রঢাকা ফুল যেমন সহসা নয়ন আকৃষ্ট করে না, সেইরূপ তাহার এই ম্লান সৌন্দর্য্য বরঞ্চ লোকের বাহবা দৃষ্টি হইতে তাহাকে ঢাকিয়া রাখে, তাহার সৌন্দর্য্য-মাধুরী অনুভব করাও একটু সময় সাপেক্ষ। তবে তাহাকে সুন্দরী বলি কি করিয়া?

তবে ইহাও বলি—ওপাড়ার কালীবাবুর ছোটমেয়ে ত সর্ব্ববাদীসম্মত রূপসী, কিন্তু তাহাকেও ত জীবন দেখিয়াছে,

তাহার রূপের তারিফও করিয়াছে বটে—কিন্তু কই তাহার রূপে ত জীবন দিব্য দৃষ্টি পায় নাই!

যদি বল রূপে নহে—স্নেহলতার গুণে জীবন আত্মহারা। তাহার উত্তর এই, স্নেহলতার মূর্ত্তিতে জীবন তাহার কল্পনার আদর্শ গুণসমূহ অনুভব করিয়াছে সত্য,—সম্ভবতঃ স্নেহলতা সে সব গুণের সত্যই অধিকারী। কিন্তু তাহার পরিচয় কি জীবন কিছু পাইয়াছে? তাই আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়—'এ ভালবাসা কেন?"

চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে ইহা একটি সত্য—কিন্তু কে বলিবে ইহা কেন? মানুষ নিজের মধ্যে একটি অসম্পূর্ণ ভাব, একটি অভাব অনুভব করে এই অভাব পূর্ণ করিতে মানুষ আর একটি আত্মার সহিত একত্ব লাভ করিতে চাহে। কিন্তু সকল আত্মার সহিত সকলের সম্মিলন হয় না, মনের মানুষ পাওয়া চাই, সুতরাং মানুষ যেখানে কল্পনার চক্ষে নিজের অসম্পূর্ণ আত্মার বাকী আধখানা দেখিতে পায়—সেইখানেই আকৃষ্ট, মুগ্ধ, এবং তাহাকে আপনার করিয়া লইবার জন্য লালায়িত হয়। যে নিয়মে পৃথিবী ঘোরে, পাতা পড়ে, মেঘ ডাকে, জীব জন্মে, সেই নিয়মে ইহাও একটি সত্য; তবে কে বলিতে পারে ইহা কেন সত্য? ইহার একমাত্র উত্তর এই, কারণের কারণ যেমন একমাত্র অনাদি কারণ—পার্থিব প্রেমের কারণও একমাত্র সেই মহান্ প্রেম—ইহা ছাড়া এ কথার আর উত্তর নাই।

মানুষ সংসারে অহরহ নিজের অসম্পূর্ণ আত্মার অপরার্দ্ধ

খুঁজিয়া সারা হইতেছে। যে সৌভাগ্যবান তাহার অদৃষ্টে খাঁটিজিনিষ মিলিয়া যায়—যদিও সাধারণতঃ এখানে এ সম্বন্ধে হীরক ভ্রমে কাচ ধরিতেই আখ্‌সার দেখা যায়।

এই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে মানব পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ, স্বর্গের অমরত্ব অনুভব করে, ক্ষুদ্র জীবনে মহান উদ্দেশ্য সাধনের বল পায়, এবং ইহার অপূর্ণতায় জীবন শূন্য অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, নিরানন্দ হইয়া পড়ে। জীবন স্নেহলতাকে আপনার করিতে না পাইয়া এই দারুণ শূন্যত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু যথার্থ যে ভালবাসিতে পারে, প্রেমের স্বর্গীয় ভাবে যাহার বিশ্বাস, নৈরাশ্যের মধ্যেও সে বল পায ; শারীরিক প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া, আকাঙ্ক্ষার আকুলতাকে অতিক্রম করিয়া, সে আত্মার সম্মিলন অনুভব করিতে পারে। তাই বুঝি নৈরাশ্যদগ্ধ হইযা জীবনের ভালবাসা আরও বিমল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—"তাহার সহিত আমার বিবাহ হইল না, এই জন্য কি সে আমার কেহ নহে! স্বর্গের তারা কত দূরে,—আমাদের নিকট হইতে কত দূরে,—তবুও সে আমাদের আলোক প্রদান করে, আনন্দ প্রদান করে। হৃদয়ে যাহার রাজ্য, সংসারে তাহাকে পাইলাম না বলিয়া কি সে আমার কেহ নহে? সমাজের প্রেমে মলিনতা আছে স্পৃহা আছে, দুঃখ তাপ আছে ; কিন্তু এই নীরব আত্মদান, পবিত্র ভক্তিপূজা নিষ্কলঙ্ক। তবে কেন এ নৈরাশ্য, কেন এ যন্ত্রণা? প্রেমে সে আমার না হউক ভক্তিতে সে আমার, শারীরিক সম্বন্ধে সে

আমার আপনার না হউক কিন্তু আত্মার সম্পর্কে সে আমার আপনার। তবে আমার দুঃখের কারণ কোথায়!"

মানুষ শরীর মন আত্মার সমষ্টি। সুতরাং মূলে মানুষের প্রেম আত্মার মিলনানুরাগ হইতে জন্মাইলেও ক্রমে মানুষ তাহার ভালবাসার বস্তুকে শরীর মন আত্মা সমস্ত দিয়া আপনার করিতে চাহে জীবনও তাহাই চাহিয়াছিল। কিন্তু যখন জীবন দেখিল সে আকাঙ্ক্ষা তাহার পূর্ণ হইবার নহে, তখন তাহার আকাঙ্ক্ষার গতিও অন্য পথ অবলম্বন করিতে চাহিল। কষ্টনিবারণেচ্ছা মানুষে সহজেই বলবতী। মানুষ যখন দেখে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূরণের কিছুমাত্র উপায় নাই, তখন মানুষের প্রত্যাশা আপনা হইতে কমিয়া আসে, ক্রমে সেই অনুযায়ী মনের বৃত্তিও গঠিত হয়। নদী যেমন স্থান অনুসারে প্রবল বেগে চলিয়াও বাধা প্রাপ্ত হইলে আপনার গতিকে পথ দেখাইতে বাধ্য হয়, মানুষের প্রেম-বৃত্তিও সেইরূপ স্থান ও অবস্থা অনুসারে স্নেহ, ভক্তি, বন্ধুত্বের আকার ধারণ করে। যে মানুষে যত মনুষ্যত্ব, যাহার প্রেম যত গভীর, নিরাশপ্রেম স্বার্থের পথ হইতে তাহাকে তত সরাইয়া পবিত্র স্বর্গরাজ্য দেখাইয়া দেয়, তত সে আপনার আকাঙ্ক্ষা নিজের আয়ত্তে আনিতে পারে। নৈরাশ্য প্রদর্শিত এই পথ মানুষ আজীবন অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে কি না জানি না—কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও ইহা তাহার নিকট সত্যরাজ্য, পুণ্যরাজ্য খুলিয়া দেয়। মানুষের যদি পূর্ণমঙ্গলে বিশ্বাস থাকে—তাহা হইলে সহস্রবার পদস্খলন করিয়াও শেষে এই পথ অনুসরণ করিতে সে চেষ্টা

করে—বল পায়। কেন না সেই সহস্র কষ্টের মধ্যেও ঈশ্বরের করুণা সে দেখিতে পায়। যাহাদের সে বিশ্বাস নাই তাহারাই যথার্থ অশান্তি ভোগ করে। সমগ্র বিশ্বসংসারকে ক্ষুদ্রএক-তাহার বিপক্ষে খড়্গ-হস্ত হইতে দেখে, সংসারের উপর অমঙ্গলের আধিপত্য ছাড়া আর সে কিছুই দেখিতে পায় না। জীবন নৈরাশ্যাভিভূত হইয়া স্বার্থের সহিত সংগ্রামে, আকাঙ্ক্ষার বিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল।

রাত্রি প্রভাত হইল, যুবতীগণ শয্যা তুলিবার ছলে দ্বারে আসিয়া বলিলেন "শ্যামচাঁদ, রাত পুইয়েছে—কুঞ্জের দ্বার খোল।"

জীবন অমনি তাড়াতাড়ি খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। যুবতীগণ ঘরে আসিয়া মশারী তুলিয়া কেহ খাটে কেহ বা নীচের বিছানায় বসিলেন। জীবন জিজ্ঞাসা করিল, "আমি বাইরে যাব?" যুবতী একজন হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীরাধিকাকে ছেড়ে কি যেতে পারবে, কাল'চাঁদ?"

স্নেহলতা টগরের কাছে বিছানায় বসিয়াছিল—সে বলিল, "জামাই বাবু বুঝি কালো, ছোড়দি!—"

ছোড়দিদি বেশ একটা রসিকতার উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন—এমন সময় ভবিদাসী একখানা চিঠি আনিয়া বলিল, "কাল বিকালে দাদাবাবুর নামে এই চিঠি এসেছিল; মা গোলেমালে তাঁকে দিতে ভুলে গেছলেন; তাই সকালেই আমাকে পাঠালেন, আর কখন বরকনে যাবে খবর নিয়ে যেতে বল্লেন। সকালে গেলেই হয় ভাল।"

স্নেহ বলিল, "বরকনে সেই সন্ধ্যা বেলাই যাবে।

জ্যেঠাইমাকে বলো এ বেলা আমরা ছেড়ে দেব না!"

দাসী বলিল, 'তা দেবে কেন? ঠাকুরপো ভগ্নিপোত হোল, দরদখানা আরো বাড়লো। আহা মোহন-দাদাবাবু এ বিয়েতেও এলেন না!"

মোহনের নাম শুনিয়া স্নেহলতা মুখ আনত করিল। জীবন্ চিঠিটা খুলিতে খুলিতে বলিল, "ইনি মোহনদার স্ত্রী?"

ভবি বলিল, "ও পোড়াকপাল! দাদা বাবু এত দিন কি তাও জানতে না!"

জীবন ঈষৎ হাসিল। এ হাসি অর্থহীন হাসি নহে, হৃদয়ের গভীরতম আনন্দ-প্রবাহ। স্নেহলতা মোহনের স্ত্রী! তবে সমাজসম্বন্ধেও জীবনের সে আপনার—তাহাকে ভক্তি করিতে সে অধিকারী! জীবন প্রাণের অন্তর্প্রাণ হইতে একটা সুখের আকুলতা অনুভব করিল। এইখানে তাহার 'ফিলজফি' হার মানিল! এই সম্বন্ধের অধিকারে তাহার এতখানি আহ্লাদের কারণ কি!!!

জীবন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া চিঠি খুলিতেছিল, খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, সহসা মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল, অশ্রুরুদ্ধ নয়নের দৃষ্টি স্নেহ-লতার উপর পতিত হইল, মুহূর্তে নিজের নৈরাশ্যদুঃখ জীবন সমস্ত ভুলিয়া গেল, অনাথিনী পতিহীনা বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া দুঃখসমুদ্রে শিশিরকণার মত তাহার দুঃখ লয় প্রাপ্ত হইল। বিদীর্ণ হৃদয়ের গভীর যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সে ভাবিতে লাগিল, "তুমি বিধবা!

দুঃখিনী !" তাহার সেই দুঃখ মোচনের জন্য প্রাণ মন আত্মা জীবন সুখে বিসর্জ্জন দিতে পারিত, কিন্তু বুঝিল তাহাতে স্নেহলতার এ দুঃখ নিবারণ হইবার নহে !

বলা বাহুল্য পত্রখানিতে জীবন মোহনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছিল।

প্রথম ভাগ

সমাপ্ত।